দিলীপ গায়েন

'হিন্দু' নামটি বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের দেওয়া

"হিন্দু নামটি একটি বৈদেশিক নাম। 'হিন্দু' শব্দটি মুসলমানদের দেওয়া, স্থানীয় (ভারতীয়) অধিবাসী এবং মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য মুসলমানরাই স্থানীয় অধিবাসীদের 'হিন্দু' নামে অভিহিত করেছিল।"

—(বাবাসাহেব আম্বেদকর, জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি—৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

"তাঁহাদের (ভারতীয়দের) দেশের 'ইন্ডিয়া' এবং দেশবাসীর 'হিন্দু' নাম ঠিক নয়। উহা বিদেশিদের উদ্ভাবিত। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত'।"

—(স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কল-৭৩)

‘হিন্দু’ নামটি
বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও
মুসলমানদের দেওয়া

দিলীপ গায়েন

প্রকাশক

পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ

রেজিস্ট্রেশন নং : S/IL/63127

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

আচার্য প্রফুল্ল নগর

থানা ও ডাকঘর : সোনারপুর, মহাকুমা ঃ বারুইপুর

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশপরগনা

কলকাতা : ৭০০১৫০

শ্রদ্ধায় স্মরণে

নরোত্তম হালদার
রণজিৎকুমার সিকদার

সূচিপত্র

ভূমিকা

ভারতীয়দের আত্মপরিচয় সংকট

কোনো ভারতবাসী আজ আর গর্ব করে বলতে পারবে না যে, সে 'ভারতীয়'। কারণ তার আত্মপরিচয়ে 'ভারতীয়' শব্দ নেই। সে স্থল কখন যে দখল করে নিয়েছে হিন্দু, ইন্ডিয়ান প্রভৃতি বিদেশিদের দেওয়া শব্দ। মানুষের সমাজে সাধারণ নিয়ম হল পিতা-মাতা-নিকটাত্মীয়রাই সন্তানের নামকরণ করে থাকেন। আমাদের 'হিন্দু' পরিচয় ও 'ইন্ডিয়ান' (Indian) পরিচয়টি দেশজ পরিচয় নয়। আমরা এখন বিদেশিদের দেওয়া নামে পরিচিত। অথচ মুসলমান রাজত্বের আগে পর্যন্ত আমাদের পরিচয়ে 'হিন্দু' শব্দ ছিল না। একইভাবে ব্রিটিশ রাজত্বের আগে পর্যন্ত 'ইন্ডিয়া' শব্দও ছিল না। তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন, তাতে ক্ষতি কী। আমরা তো অনেক বিদেশি শব্দই নিজের করে নিয়েছি।

হ্যাঁ, তা নিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের কি দেশজ কোনো নাম-পরিচয় ছিল না যে, বিদেশিদের দেওয়া নামে পরিচিত হতে হল? ভারতের দেশজ ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিচয় হল—সনাতন, বৌদ্ধ, জৈন, সারি, চার্বাক প্রভৃতি বস্তুবাদী দর্শন। আর আমাদের ভূখণ্ডের নিজস্ব নাম জম্বুদ্বীপ, ভারত। আমাদের এই দেশজ পরিচয়টা কি ক্ষতিকারক ও লজ্জাজনক ছিল? আমরা যারা 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' শব্দের পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছি নিঃসন্দেহে তারা আত্মবিস্মৃত ও পর মুখাপেক্ষী জাতি। বিদেশিরা যেন মেরে ধরে আমাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে বহিরাগত আর্যগোষ্ঠী (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) এবং আদি ভারতীয় সনাতনী-বৌদ্ধ-জৈন-সারি-চার্বাক গোষ্ঠী (SC-ST-OBC) কিভাবে তাদের স্বনাম ও দেশজ পরিচয় হারিয়ে ফেলে বিদেশিদের দেওয়া নাম ধারণ করেছে তা অতিসংক্ষেপে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। আমার উদ্দেশ্য আমাদের আত্মপরিচয় সংকট থেকে মুক্তি লাভ করা। সুধী পাঠকসমাজ আমার সাথে সহমত পোষণ করবে, এই আশা রাখছি। ইতিহাস, তথ্য ও বিচার-বিশ্লেষণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধনের আবেদন রাখছি পাঠক সমাজের কাছে। পরবর্তী মুদ্রণ ও সংস্করণে অবশ্যই তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লিখিত হবে।

—দিলীপ গায়েন

শুভেচ্ছা বার্তা

'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' নাম-পরিচয়টি আমাদের দেশজ পরিচয় নয়। বিভিন্ন তথ্য সহযোগে বর্তমান গ্রন্থে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন দিলীপ গায়েন। অজস্র ধন্যবাদ জানাই তাঁকে এই কারণে যে, তিনি আমাদের আত্মপরিচয় সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

২৯ এপ্রিল ২০১৮
২৫৬৪তম বুদ্ধ-জয়ন্তী

হারানচন্দ্র সরদার
(মহাস্থবির)
পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, বারুইপুর,
দক্ষিণ চব্বিশপরগনা

ভারতের প্রাচীন ধর্মের নাম 'সনাতন ধর্ম'

বর্তমান ভারতে ধর্মের তালিকায় আমরা হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, সারি, লিঙ্গায়েৎ, আদিধর্ম, রবিদাসিয়া ধর্ম, মতুয়া ধর্ম প্রভৃতি বহু নাম-পরিচয় লক্ষ করছি। আমাদের প্রাচীনতম ভারতে এসব নাম ছিল না। তখন ধর্মের নাম ছিল প্রাকৃতিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। আদি ভারতীয় প্রাকৃতিক ভাষায় তা 'সনন্তনো ধম্ম' নামেই পরিচিত ছিল। 'সনাতন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ শাশ্বত চিরন্তন সত্য, চিরসত্য। প্রকৃতি (Nature) যেহেতু চিরন্তন সত্য সেহেতু প্রাকৃতিক ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হত।

ভারতে তখনও আর্যদের আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তার বহু আগে ভারতে মানবসভ্যতার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছিল। অসুর বা অস্ট্রিক সভ্যতা, মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা—সবই প্রাক-আর্য ভারতের মানবসভ্যতা। প্রাচীন ভারতীয় মানবসভ্যতায় ধর্মের নাম ছিল প্রাকৃতিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বায়ু, বৃক্ষ, মাটি, নদী, পাহাড়, মানুষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান বা সম্পদকেই চূড়ান্ত সত্য (Absolutely truth) বলে মনে করা হত। এসব প্রাকৃতিক শক্তির (Natural Power) নেপথ্যে কোনো ভাববাদ, অলৌকিকতা, অবাস্তব ঈশ্বর-দেব-দেবী-আত্মা-স্বর্গ-মন্ত্র-পুজো প্রভৃতি বুজরুকি তত্ত্ব ছিল না। প্রাচীন ভারতের মানুষদের মাথায় এসব কল্পনা আসেই নি। তাঁরা প্রকৃতির পূজারি তথা সংরক্ষক ও পালক ছিলেন। বর্তমান যুগে পরিবেশ রক্ষার জন্য বায়ুদূষণ রদ, জলদূষণ রদ, মৃত্তিকাদূষণ রদ, জলসুরক্ষা, বৃক্ষ রোপণ, সূর্যের ওজোন স্তর রক্ষা প্রভৃতি প্রকৃতি রক্ষা সংক্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ রকমই ছিল প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি। বর্তমান ধর্মে যে মূর্তিপুজো, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, পোপ-পাদ্রী-ইমাম-মৌলবীতন্ত্র, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠ, প্রার্থনা-স্তব ইত্যাদি ধর্মীয় আড়ম্বর দেখা যাচ্ছে তা প্রাচীন ভারতের সিন্ধু-হরপ্পা যুগে ছিল না। ভারতে ধর্মের নামে এই ধরনের আড়ম্বর শুরু হয়েছে হরপ্পোত্তর বৈদিক যুগ থেকে।

সিন্ধু-হরপ্পার খনন কার্য থেকে পাওয়া গেছে সিংওয়ালা মানুষের মূর্তি, কিছু নারীমূর্তি এবং অন্য কিছু পশুমূর্তি। এসব দেখে অনেকেই দাবি করেন—সে যুগের মানুষেরা নারীদেবতার পুজো করতেন এবং পশুপতি শিবের উপাসক ছিলেন, ইত্যাদি।

সিন্ধু-হরপ্পার ধর্ম সম্পর্কে এই দাবি যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণ করেছেন বুদ্ধ ও জৈন দুই সমাজ বিজ্ঞানী। এঁরা সিন্ধু-হরপ্পার সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে। সনাতন ধর্ম যেমন নিরীশ্বরবাদী ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও নিরীশ্বরবাদী ছিল। ধর্মে নিরীশ্বরবাদের তত্ত্ব বুদ্ধ ও জৈন পেয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ধর্ম থেকে। সুতরাং সিংওয়ালা মানুষের মূর্ত্তিকে শৈবমূর্ত্তি বা নারীমূর্ত্তিকে দেবীমূর্ত্তি, ইত্যাদি অনুমান নিছক এ যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী মননের প্রতিফলন মাত্র। আসল কথা, বর্তমান যুগের মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর্য শিল্পীরা যেমন পাথর বা মাটি দিয়ে নানা মূর্ত্তি তৈরি করেন তেমনি সিন্ধু-হরপ্পার খননকার্যে প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলো সে যুগের মানুষের শিল্পসত্তা। সিংওয়ালা মানুষের মূর্ত্তি হতে পারে পশুপ্রেমের চিহ্ন। নারীমূর্ত্তি হতে পারে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার নিদর্শন বা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। এখানে দেবত্ব আরোপ করা অতিরঞ্জিত বিষয়। যেমন বর্তমান কলকাতা সহ বিভিন্ন শহর ও শহরতলীর রাস্তাঘাটে, মোড়ে মোড়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নেতাজি প্রমুখের মূর্ত্তির ছড়াছড়ি। আজ থেকে দু'হাজার বছর পরে যদি সেকালের মানুষেরা এঁদেরকে স্বর্গের দেবতা বলে দাবি করেন সে দায় কাদের? আজও কলকাতার শিশিরমঞ্চে, গগনেন্দ্র মঞ্চে, নন্দনে, রবীন্দ্রসদনে শিল্পীদের আঁকা কল্পিত ছবি, মূর্ত্তি ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়ে থাকে। কোথাও তো দেবত্ব নেই। এগুলো যদি ভবিষ্যতে দেব-দেবী বলে চালানো হয় সে দায় বর্তমান শিল্পীদের নয়।

আর্যদের বৈদিকযুগে ধর্মীয় পরিচিতি

ঐতিহাসিক, গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদদের অভিমত খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ১২০০ অব্দের মধ্যে ইরান-পারস্য থেকে আর্য দস্যুরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। 'ইরান' শব্দ থেকেই 'আর্য' নামের উৎপত্তি—ইরান-এরিয়ান-আর্য (Iran-Arian-Arya)। আর্যরা যে বহিরাগত, তা তাদের আত্মপরিচয়েই প্রমাণিত। আর্যরা দস্যু বেশে এসেছিল। ঋকবেদের তথ্যানুযায়ী বলা যায়—আর্যদের সঙ্গে সিন্ধুবাসীদের তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আর্যরা বিজয়ী হয় এবং পরাজিত হয় আদি ভারতীয়রা। আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংস ঘটিয়ে বৈদিক সভ্যতার পত্তন ঘটায় এবং সনাতন ধর্মের ধ্বংস ঘটিয়ে প্রবর্তন করে আর্য ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম। একে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। আর্যরা তাদের ধর্মে দেবত্ব

আরোপ করে এবং মানুষে-মানুষে উঁচু-নিচু ভেদ প্রথা 'বর্ণাশ্রম' চালু করে, যা প্রাক-আর্য ভারতের সনাতন ধর্মে ছিল না। আর্য-ব্রাহ্মণরা ঘোষণা করেছিল—প্রকৃতির নেপথ্যে দৈবীশক্তি আছে যার নাম ব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা (খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মেও এ জাতীয় মত আছে)। আর্যরা পৃথিবীকে বলেছিল ব্রহ্মার সন্তান তথা ব্রহ্মার অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড অর্থ ডিম। মাটির তৈরি দেব-দেবীর আবির্ভাব বৈদিকযুগে ঘটেনি। তবে ঈশ্বর, স্বর্গ, আত্মা, পুনর্জন্ম, মন্ত্র, যজ্ঞ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক যুগে। ব্রাহ্মণরা সবার উপর মাতব্বরি করার উদ্দেশে বর্ণাশ্রম আইন চালু করেছিল। আর্যরা তিন বর্ণে নামাঙ্কিত হয়েছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। বর্ণাশ্রম আইনে বলা হল—ব্রহ্মের মুখ থেকে জন্ম ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে জন্ম বৈশ্যের এবং পরাজিত ভারতীয়দের তারা 'শূদ্র' বর্ণে পতিত করে দিল। বলা হল—ব্রহ্মের পা থেকে শূদ্রের জন্ম (দ্রঃ ঋকবেদ, ১০ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ১১-১২ শ্লোক এবং মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক)। ভারতে ডিভাইড এন্ড রুল প্রথার জনক আর্যরা। বর্তমান ভারতে যাকে হিন্দু ধর্ম বলা হচ্ছে তার প্রাচীনতম নাম আর্য-ধর্ম বা বৈদিকধর্ম।

বৌদ্ধযুগে ধর্মীয় পরিচিতি

সিন্ধু-হরপ্পাযুগের পর যেমন বহিরাগত আর্যদের নেতৃত্বে বৈদিকযুগের অভ্যুত্থান ঘটেছিল তেমনি বৈদিকযুগের পর মূল ভারতীয়দের উদ্যোগে বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব হয়েছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধের জন্ম ৬২৩ খ্রিঃপূঃ এবং মহাপরিনির্বাণ ৫৪৪ খ্রিঃপূঃ। মহাবীর বর্ধমান জৈনের জন্ম ও মহাপরিনির্বাণ যথাক্রমে ৫৪০ খ্রিঃপূঃ এবং ৪৬৮ খ্রিঃ পূঃ। এঁরা আর্য- ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত ছিলেন না। এঁরা প্রাক-আর্য ভারতীয় ক্ষত্রিয় তথা রাজ বংশজাত সন্তান। 'ক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ রাজা, ক্ষেত্রের শাসক, রক্ষক, পালক। এই দুই আদিভারতীয় তথা আদিবাসী সন্তানের নেতৃত্বে বৌদ্ধ ও জৈন নামে ভারতে সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ হয়। বুদ্ধের বাবা শুদ্ধোদন পাহাড়ী আদিবাসী শাক্য বংশীয়। মা মহামায়া ছিলেন কোল বংশীয়। মহাবীরের বাবা সিদ্ধার্থ ছিলেন আদিবাসী জ্ঞাতৃক বংশীয়। মা ত্রিশলা ছিলেন আদিবাসী লিচ্ছবী বংশীয়। বর্তমান ভারতের সংবিধানে এঁরা তফসিলি উপজাতি (ST) নামেই চিহ্নিত।

সর্বভারতীয় স্তরে বৌদ্ধযুগ বলতে আমরা বুঝবো বুদ্ধ ও জৈনের সময় থেকে মৌর্য রাজত্বের অবসান ও তার পরে কিছু বছর। পূর্বভারতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধযুগ বলতে বুঝবো পালযুগ পর্যন্ত (১০৫০খ্রিঃ) সময়কে। খ্রিঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের দ্বারা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং মগধের (বিহার) সিংহাসনে শুঙ্গরাজত্ব শুরু হয়। সম্রাট অশোকের কন্যাপক্ষের নাতি বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ।

সর্বভারতীয় স্তরে মৌর্যযুগ এবং পূর্বভারতে পালযুগ এই সময় কালকেই আমরা বৌদ্ধযুগ বলে চিহ্নিত করছি।

এই সময়কালে ভারত সহ বিশ্বের বহু দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। মূলত রাজশক্তির সহযোগিতায়। মৌর্যরাজগণ ও পাল রাজগণ উভয়ই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। আর্য-আক্রমণ ও তাদের বৈদিকধর্মের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল সনাতন ধর্ম। আদিভারতীয় জনগণ বৈদিকধর্মে শূদ্র ও দাসে পরিণত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে সেই শূদ্ররা ফের স্বাধীনতার স্বাদ পায়। বৌদ্ধযুগে ঈশ্বর তত্ত্ব ও বর্ণাশ্রম আইন খারিজ করা হয়। মানুষ ফের প্রকৃতি ধর্মাবলম্বী হয়। আর্য-ব্রাহ্মণরা অবশ্য বৌদ্ধ-অনুরাগী ছিল না। তারা বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস সাধনে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

বুদ্ধ সনাতন ধর্মেরই পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং।

অবরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।।

অর্থঃ জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতার ধ্বংস করা যায় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার ধ্বংস করা যায়, ইহাই সনাতন ধর্ম।

বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে আর্যদের বৈদিকধর্মে বর্ণাশ্রম আইন প্রবর্তন করে হিংসার ধর্ম চালু করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্বিচারে নিধন ও বঞ্চিত হত শূদ্র, শ্রমিক তথা আদিভারতীয়রা। বুদ্ধ তাই বলেছিলেন, এটা সনাতন ধর্ম নয়, এটা শত্রুতার ধর্ম। বৈদিকধর্ম শত্রুতার ধর্ম।

গৌতম বুদ্ধ সিন্ধু-হরপ্পা যুগের সনাতন তথা অহিংসামূলক প্রকৃতি ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তার প্রমাণ ঃ (১) সিন্ধু-হরপ্পার খনন কার্যে সূর্যের চিহ্ন স্বরূপ 'সূর্যচক্র' ও জীবনমুখীনতার প্রতীক স্বরূপ 'স্বস্তিকা' চিহ্ন (卍)

পাওয়া গেছে। বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘগুলোতে ধম্মচক্ক (ধর্মচক্র) প্রবর্তন করে সেই সূর্যচক্রকেই পুনপ্রবর্তন করেছিলেন। প্রকৃতি জগতে সূর্যই সকল শক্তির উৎস। বুদ্ধের ধম্মচক্ক সেটাই প্রকাশ করেছে। (২) সিন্ধু-হরপ্পাযুগের সনাতন ধর্ম ছিল নিরীশ্বরবাদী, মানবতাবাদী, বস্তুবাদী। বৌদ্ধধর্মও তাই। বুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল, চার বোধসত্য—কোথাও ঈশ্বর-আত্মা-পরজন্ম-দেব-দেবী- মন্ত্র-পুজো-প্রার্থনা নেই। বুদ্ধ ছিলেন প্রকৃতিপন্থী। বৌদ্ধসম্রাট অশোক সেই ধর্ম সারা বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। জৈনধর্মেও ঈশ্বর তত্ত্ব নেই।

শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত-সেন প্রভৃতি যুগে ধর্মীয় পরিচিতি

মৌর্য রাজগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাঙলার পাল রাজগণও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মৌর্যসম্রাট অশোকের কন্যাপক্ষের নাতি বৃহদ্রথই শেষ মৌর্যসম্রাট। খ্রিঃ পূঃ ১৮৫ অব্দে তাঁকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সিংহাসনে বসেন। তখন মগধ (বিহার) ছিল ভারতের রাজধানী। এদিকে বাঙলায় শেষ পাল রাজা মদনপালকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজত্বের অভ্যুত্থান ঘটান সামন্ত সেন ও হেমন্ত সেনরা। মগধে শুঙ্গযুগের পর বিদেশি হূণদের নেতৃত্বে কুষাণবংশ রাজত্ব করে। এই বংশের রাজা কণিষ্ক (৭৮—১০১ খ্রিঃ) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কুষাণ পরবর্তী সাতবাহন-গুপ্ত বংশীয়রা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃতি ও মূলনিবাসী বৌদ্ধদের পরাধীন করার উদ্দেশে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসসাধনে হস্তক্ষেপ করেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। তাঁর আইনমন্ত্রী ও সভাকবি সুমতি ভার্গব। পুষ্যমিত্রের নির্দেশে তিনি 'মনুসংহিতা' নামক একটি সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে আর্য-ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির স্বার্থ সুরক্ষিত করা হল, বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বংস ঘটিয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটানো হল। ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বলা হল শ্রেষ্ঠধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মকে বলা হল ম্লেচ্ছ ধর্ম, চোরের ধর্ম, বৃষলধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মকে ধরাশায়ী করার জন্য বৌদ্ধ শিক্ষালয় (মঠ) ধ্বংস, বৌদ্ধনির্যাতন, বৌদ্ধ বিতাড়ন, বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটকের ধ্বংস ইত্যাদি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত প্রভৃতি যুগে। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তযুগ

বহাল ছিল। বাঙলায় সেনযুগের স্থায়ীত্বকাল ১০৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য আর্য তিন বর্ণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থা হয়তো কর্মভিত্তিক ছিল। কিন্তু মনুসংহিতার সময় থেকে তিনবর্ণের মধ্যে বর্ণব্যবস্থা জন্মভিত্তিক হয়ে যায়। বৈদিকযুগে বা পরবর্তী মনুসংহিতার যুগে শূদ্র বর্ণ কখনোই আর্য তিনবর্ণে ঢুকতে পারে নি। বর্তমান হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠবর্ণ ও পুরোহিত বর্ণ বলে মান্যতা দেওয়া হয়। মৃত্যুকালীন অশৌচবিধি ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারদিন, বৈশ্যের পনেরদিন এবং শূদ্রের তিরিশদিন। ব্রাহ্মণকে ষোড়শদান বা দ্বাদশদান। শূদ্রবর্ণকে শিক্ষা বহির্ভূত রাখা। নারীজাতিকে অধিকারহীন রাখা। এসবই মনুসংহিতার আইন, সবই লিপিবদ্ধ আছে এ গ্রন্থে। আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা রক্ষার জন্য কৌলিন্যপ্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা, বিধবার সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি চালু হয়েছিল মনুসংহিতার পর থেকে। বৌদ্ধ ও শূদ্রদের কানে গরম তেল দেওয়া, জিহ্বা কেটে নেওয়া, বিদেশগমন নিষিদ্ধ সবই শুঙ্গ থেকে সেন যুগের ফতোয়া। ভারতে মুসলিম আমল (১৭৫৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত হিন্দুসমাজে মনুসংহিতার আইনই ছিল শেষ কথা। মুসলমান আমল পর্যন্ত হিন্দুসমাজের শূদ্র (SC-ST-OBC) এবং যে কোনো বর্ণের নারী শিক্ষার অধিকার পায়নি। অবাধে চলেছে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, শূদ্রনির্যাতন প্রভৃতি বর্বরোচিত প্রথা। ফলে, ভারতের ইতিহাসে শুঙ্গ যুগ (খ্রিঃ পূঃ ১৮৫) থেকে মুসলমান যুগ (১৭৫৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ, অন্ধকারযুগ এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগ বলা হয়। এই সময়কালে হিন্দু সমাজ মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারাই পরিচালিত হত।

ভারতে মুসলমান আমলে ধর্মীয় পরিচিতি

১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মুসলিম রাজত্বের যুগ বলা হয়। ভারতে বিদেশি মুসলমানদের রাজনৈতিক শাসনের সূচনা ঘটান আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের সম্রাট মহম্মদ ঘুরী। ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অঞ্চলের সুলতান ও উচ জয় করেন ঘুরী। তারপর পেশোয়া, লাহোর, পশ্চিম পাঞ্জাব দখল করেন। এই সময় দিল্লি ও আজমীরের (রাজস্থান) সম্রাট ছিলেন ব্রাহ্মণ চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম

যুদ্ধে ঘুরী হেরে যান পৃথ্বীরাজের কাছে। কিন্তু পরের বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয়যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে নিহত করে দিল্লি দখল করেন ঘুরী। এরপর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে ঘুরী স্বদেশে ফিরে যান। কুতুবের অন্যতম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার এবং ১২০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে বাঙলা দখল করেন। এভাবেই ক্রমশ সারা ভারতে মুসলিম রাজত্ব শুরু হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীযুদ্ধে বাঙলার নবাব সিরাজউদদৌলার পতন হয় ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। ভারতে শুরু হয় ব্রিটিশ রাজত্ব।

মুসলমান রাজত্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তো ছিলই, উপরন্তু ইসলামধর্মের ক্রম বিকাশ ঘটল। এবং ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামের তীব্র প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম আরো কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অত্যাচারিত বৌদ্ধরা বাঁচার তাগিদে অনেকেই ইসলামে আশ্রয় নিয়েছিল। বৌদ্ধদের এই ইসলামে ধর্মান্তকরণ রদ করার জন্য অস্পৃশ্য সমাজের গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিঃ) এবং ব্রাহ্মণসমাজের শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রিঃ) যথাক্রমে শিখ ও বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন করেছিলেন। মুচির সন্তান রবিদাসও (১৪৩৩—১৫৫৯ খ্রিঃ) আলাদা ধর্ম প্রবর্তন করেন যা পরে রবিদাসিয়া ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে মুসলমান শাসকদের উদ্যোগে ইসলাম ধর্মই সর্বাধিক প্রচারিত হয় মুসলমান আমলে।

ব্রিটিশ আমলে ধর্মীয় পরিচিতি

ভারতে আদিভারতীয় মানুষদের উদ্যোগে সনাতন, বৌদ্ধ, জৈন, লিঙ্গায়েৎ, শিখ, রবিদাসিয়া, সারি, মতুয়া, প্রভৃতি 'নিরীশ্বরবাদী' ধর্মমত প্রচারিত হয়েছে। তেমনি পাশাপাশি প্রচারিত হয়েছে বিদেশিদের দ্বারা প্রচারিত ধর্মমতও। বৈদিকধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম, হিন্দুধর্ম এসেছে বিদেশি আর্যদের হাত ধরে। ইসলাম ধর্ম এসেছে বিদেশি মুসলমানদের হাত ধরে। তেমনি ব্রিটিশ আমলে খ্রিস্টধর্ম এসেছে বিদেশি ইংরেজদের হাত ধরে।

ব্রিটিশ শাসকরা বুঝেছিলেন, বহিরাগত আর্যরা এ দেশের প্রাকৃতিক ধর্ম, বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি মতকে প্রতিহত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন

করেছিল। ধর্ম এমনই একটি বিষয় যার দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করা যায়। ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্মের দ্বারা সেটাই করে চলেছে। একইভাবে মুসলমানরাও ইসলামের প্রভাব খাটিয়ে বহু মানুষকে মুসলমান বানিয়ে এ দেশে মুসলিমী শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। ব্রিটিশরাও সেই রাস্তা নিয়েছিল। তারা খ্রিস্টধর্মের প্রচার, প্রসার বৃদ্ধি করে ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের অনুগত করতে চেয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা গির্জা স্থাপন, মিশনারী স্কুল তৈরি, বাইবেল-এর অনুবাদ, জমি ও অর্থ দান, ইংরাজী ভাষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মসূচি নিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন।

মোট কথা, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্মের আগমন, প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। রাজনীতি ও ধর্মকে যাঁরা পৃথক দুটি বিষয় বলে মনে করেন তাঁরা সম্ভবত ইতিহাসের এই ঘটনাবলী বিচার করে দেখেন না।

'হিন্দু' নামটি বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের দেওয়া

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কায়স্থ, বৈদ্য, রাজপুত, সুবর্ণবণিক, তফসিলি জাতি (Scheduled Caste), আদিবাসী (Scheduled Tribe), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (Other Backward Classes) সহ বহু জনগোষ্ঠী আজ হিন্দুজাতি বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী হয়ত নিজেদের 'হিন্দু' বলে মনে করে না। হয়ত তারা কোনো জাতি বা ধর্মের নামে নিজেদের পরিচিত করতে চায় না। তবে, বৃহত্তর অর্থে এদেরকেও 'হিন্দু' বলে মনে করা হয়। কারণ, এদের ধর্মীয় পরিচিতিতে বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, শিখ, খ্রিস্ট, পারসিক প্রভৃতি ধর্মীয় তকমা নেই।

'হিন্দু' পরিচিত মানব সমাজের মূল বাসভূমি ভারত। বহিরাগত আর্য এবং আদি ভারতীয় মানুষেরাই ক্রমশ 'হিন্দু' পরিচিতি ধারণ করেছে। ভারতের বাইরে অন্য কোনো দেশের জনগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী নয়। তবে, প্রবাসী ভারতীয়রা অনেকে অবশ্য হিন্দু হিসেবে পরিচিত। নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সহ ভারতের প্রতিবেশী কিছু রাষ্ট্রে 'হিন্দু' জনগণ বসবাস করেন। একসময় এই দেশগুলো বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ ছিল।

ঘটনা হল, ‘হিন্দু’ পরিচিত এই বৃহত্তর ভারতবাসী ও বিশ্বের কিছু মানুষ এক সময় ‘হিন্দু’ নামে পরিচিত ছিল না। তখন তাদের একাংশ সনাতনী, বৌদ্ধ, জৈন, অসুর, দাস, দস্যু শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নিচুজাত ইত্যাদি এবং অন্য অংশ আর্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দেবতা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। ভারতে মুসলমান আমলের (১২০০-১৭৫৭ খ্রিঃ) আগে পর্যন্ত এ দেশে কেউই ‘হিন্দু’ নামে পরিচিত ছিল না। ভারতে বসবাসকারী আর্য এবং আদিভারতীয়দের (অনার্য) ‘হিন্দু’ বলে সর্বপ্রথম লিখিত পরিচয় দান করে মুসলমান সরকার। তার বহু আগে অবশ্য বিদেশের মাটিতে ও বিদেশের গ্রন্থে ভারতীয়দের ‘হিন্দু’ বলা হত। ইতিহাস বলছে, পারসিকরাই (ইরান) সর্বপ্রথম ভারতীয়দের ‘হিন্দু’ বলেছিল। তারপর গ্রিকরা। অবশেষে ভারতে বিদেশী মুসলমানদের (পাঠান-মুঘল) শাসন কায়েম হলে তারাই লিখিতভাবে ‘হিন্দু’ শব্দ ব্যবহার করে তাদের সরকারি দলিল-দস্তাবেজে ও নথিপত্রে। এরপর মুসলমান আমলে ভারতের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের কাব্যে ‘হিন্দু’ শব্দের ব্যবহার শুরু করেন।

ভারতে মুসলমান আমলের আগে পর্যন্ত লিখিত কোনো গ্রন্থে ‘হিন্দু’ শব্দ নেই। বেদ, বেদান্ত, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক সংহিতা, পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ১৮টি বা তার অধিক সংখ্যক পুরাণ, বৌদ্ধদের ‘ত্রিপিটক’ জৈনদের ‘কল্পসূত্র’— কোথাও ‘হিন্দু’ শব্দ নেই। সিন্ধু-হরপ্পার যুগ, বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, বিম্বিসার-অজাতশত্রু-বিন্দুসার-অশোক-শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত-পাল-সেন-হর্ষবর্দ্ধন-শশাঙ্ক প্রভৃতি যুগে বা রাজত্বকালে ‘হিন্দু’ নামক কোনো শব্দ কোনো গ্রন্থে ছিল না। কোনো ধর্মের নামও ‘হিন্দু’ ছিল না। আর্যরা যে ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করত তা বর্তমান যুগে বৈদিকধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি বলা হলেও মুসলমান আমলের আগে পর্যন্ত তাদের ধর্মের কোনো নামই ছিল না। তবে অনার্য-অব্রাহ্মণ আদিভারতীয়দের মধ্যে সনাতন, সদ্ধম্ম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নাম পরিচিতি চালু ছিল এবং তাদের গ্রন্থেও এসব শব্দ-ভাষা ছিল। তবে, বেদ-বেদান্ত-মনুসংহিতা রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ‘হিন্দু’ শব্দ না থাকলেও বৌদ্ধ, সনাতন, আর্য, অনার্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, দাস, দস্যু চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, জৈন, নিচুবর্ণ, শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নারায়ণ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি ধর্ম নাম, জাতি নাম ও দেব-দেবীর নাম ছিল বা আছে।

'ইন্ডিয়া' নামটিও বিদেশিদের দেওয়া

আমরা ভারতবাসী। 'ভারতীয়' শব্দে পরিচিত হতে চাই। এটাই আমাদের আত্মপরিচিতির গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু ঘটে গেছে উল্টো ঘটনা। আমাদের আত্মপরিচিতিতে কালির আঁচড় মেরেছে বিদেশিরা। আমরাও নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে সেই কালিতে মুখ ঢেকে ফেলেছি। আমরা ভারতের নাগরিক হলেও আমাদের আত্মপরিচিতিতে এবং ধর্মীয় পরিচিতিতে বিদেশি নামের প্রভাব। 'হিন্দু' এবং 'ইন্ডিয়া' দুটো শব্দই বিদেশিদের দেওয়া। আর্য-ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্তমান নাম হিন্দুধর্ম। একইভাবে 'ভারত'-এর প্রতিশব্দ হয়ে গেছে 'ইন্ডিয়া' (India) । 'হিন্দু' শব্দটি ফারসী শব্দ, 'ইন্ডিয়া' শব্দটি গ্রিক শব্দ। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আমাদের আত্মপরিচিতিতে 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' শব্দ কী সম্মানজনক?

কার্যত, 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' শব্দ দুটোর উৎসমূল এক। ফারসী শব্দ 'হিদুষ' ক্রমশ ইন্ডু-ইন্দু-হিন্দু-ইন্ডিকা-ইন্ডিয়ায় পরিণত হয়েছে। পারসিকরা তাদের দেশে ভারতীয়দের উদ্দেশে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছিল। একইভাবে গ্রিকরাও তাদের দেশে ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়া নামে অভিহিত করেছিল। ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে লিখিতভাবে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয় মুসলমান রাজত্বে (১২০০—১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। একই ভাবে 'ইন্ডিয়া' (India) শব্দটিও ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সর্বপ্রথম লিখিতভাবে ব্যবহৃত হয় ব্রিটিশ রাজত্বে (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ)। পারসিকদের দেওয়া 'হিন্দু' নাম ভারতের মাটিতে ব্যবহার শুরু করে মুসলমানরা। গ্রিকদের দেওয়া 'ইন্ডিয়া' শব্দ ভারতের মাটিতে ব্যবহার শুরু করে ইংরেজরা। ভারতে মুসলমান রাজত্বের আগে 'হিন্দু' শব্দ প্রচলিত ছিল না ভারতের মাটিতে। তেমনি ইংরেজ রাজত্বের আগে 'ইন্ডিয়া' শব্দও চালু ছিল না ভারতের মাটিতে। 'ইন্ডিয়া' শব্দ চালু ছিল না তার প্রমাণ, বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত কোথাও 'ইন্ডিয়া' শব্দ নেই। বেদব্যাস রচিত মহাকাব্যের নাম 'মহাভারত'। 'মহাইন্ডিয়া' নাম নেই। 'বেদ' গ্রন্থেও 'ভারত' শব্দ পাওয়া যায়।

'ইন্ডিয়া' (India) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকের (৬০০—৪০১ খ্রিঃপূঃ) ঐতিহাসিক। তিনি কোনোদিন ভারতে আসেননি। পারসিকদের দেওয়া 'হিদুষ'

শব্দে প্রভাবিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষকে তাঁর গ্রিক ভাষায় 'ইন্ডিয়া' (India) বলে অভিহিত করেন।

সম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তাঁর রাজত্বকাল (৩২৪—৩০০ খ্রিঃপূঃ)। এই সময় সিরিয়া ও ভারতের একাংশের সেনাপতি বা সম্রাট ছিলেন গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের উত্তরসূরী সেলুকাস। তাঁর সাথে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ-সন্ধি ও শেষ-পর্যন্ত সেলুকাস কন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে একজন রাষ্ট্রদূতকে প্রেরণ করেন সেলুকাস। মেগাস্থিনিসও 'ইন্ডিকা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে ভারতকে ইন্ডিকা বলেই অভিহিত করেছিলেন।

ভারতের মাটিতে মুসলমান রাজত্ব পর্যন্ত (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) লিখিতভাবে গ্রিকদের দেওয়া 'ইন্ডিয়া' শব্দ প্রচলিত হয়নি। মুসলমান পরবর্তী ব্রিটিশ রাজত্বেই (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ) লিখিতভাবে 'ইন্ডিয়া' (India) শব্দ চালু। তবে ব্রিটেনের মাটিতে আরো ১৫০ বছর আগে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জর্জ হোয়াইট এবং জন ওয়ার্ডের নেতৃত্বে 'ইস্ট-ইন্ডিয়া' কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। বণিক সংস্থা। ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ ওই বছরই কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্যের জন্য ছাড়পত্র দেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯—১৬২৭ খ্রিঃ) কাছ থেকে এ দেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে।

এভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ (১) 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' শব্দ দুটোর উৎসমূল ফারসী 'হিদুষ' শব্দ। (২) 'হিন্দু' শব্দটি পারসিকদের দেওয়া এবং ভারতে সর্বপ্রথম তা প্রয়োজ্য হয় মুসলমান রাজত্বে। 'ইন্ডিয়া' শব্দটি গ্রিকদের দেওয়া। ভারতে সর্বপ্রথম তা প্রযোজ্য হয় ইংরেজ রাজত্বে। (৩) আর্যরা (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) তাদের আত্মপরিচিতি হারিয়ে বিদেশিদের 'হিন্দু' নাম ধারণ করেছে মুসলিম রাজত্ব থেকে ব্রিটিশরাজত্বের মধ্যে (১২০০—১৯৪৭ খ্রিঃ)। পাশাপাশি দলে ভারি করার স্বার্থে বৌদ্ধ-জৈন-শিখ বা শূদ্র-অচ্ছুৎ-ম্লেচ্ছ সব জনগোষ্ঠীর গায়েও 'হিন্দু' তকমা লাগিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ আমলে। (৪) আর্যদের বৈদিকধর্মের নামটিও এখন হিন্দুধর্ম হয়ে গেছে। (৫) 'সিন্ধু' শব্দ থেকে যদি 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হয় তাহলে বলতে হবে 'হিন্দু' একটি বিকৃত শব্দ।

'হিন্দু' শব্দের প্রথম ব্যবহার

বর্তমান ভারতে হিন্দুরা যে 'হিন্দু' নাম ধারণ করেছে বা নিজেদের ধর্মীয় পরিচিতিও 'হিন্দু' করে তুলেছে, তা নিজেদের নামাঙ্কিত নয়। 'হিন্দু' নামটি ভারতীয় শব্দ (word) নয়। সংস্কৃত, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশি ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে 'হিন্দু' শব্দটি নেই। 'হিন্দু' শব্দটি বিদেশি 'ফরাসী' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশি বহু ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ভারতীয় ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে।

'হিন্দু' শব্দটি সর্বপ্রথম কে বা কারা এবং কবে ব্যবহার করেছিল তার কিছু সূত্র আমরা ইতিহাস ও অতীতের গর্ভগৃহ থেকে উদ্ধার করতে পারি ঃ (১) পারস্য সম্রাট সাইরাস (৫৫৯-৫৩০ খ্রিঃ পূঃ) ও তাঁর পৌত্র দরায়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রিঃপূঃ) ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত সিন্ধু-পঞ্জাব অঞ্চল দখল করে পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সেই সময় তাঁরা এই অঞ্চলকে 'হিদুষ' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ৩২৭খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিকবীর আলেকজাণ্ডার ভারত-আক্রমণ করলে পারস্য সম্রাটগণ দুর্বল হয়ে যান। তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। (২) খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৪০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। তিনি ভারতে আসেননি বটে, তবে পারসিকদের লেখা-বইপত্র পড়ে 'হিদুষ চিহ্নিত স্থানকে 'ইণ্ডিয়া' (India) নামে অভিহিত করেন। (৩) মৌর্যসম্রাট অশোকের পিতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল ৩২৪—৩০০ খ্রিঃপূঃ। এইসময় তাঁর রাজসভায় আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাস একজন রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। তাঁর নাম মেগাস্থিনিস। ইনি 'ইণ্ডিকা' নামে একটি গ্রন্থে ভারতকে 'ইণ্ডিকা' বলে অভিহিত করেন। কালক্রমে হিদুষ > ইণ্ডিয়া > ইন্ডু > ইন্দু > হিন্দু শব্দে পরিণত হয়। (৪) ২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানিয়া শাসকের একটি শিলালেখতে 'হিন্দুস্তান' শব্দটি পাওয়া যায়। (৫) দশম শতকের (৯০১-১০০০ খ্রিঃ) শেষভাগে অজ্ঞাতনামা এক লেখক তাঁর 'হুদুদ অল্ আলম' গ্রন্থে ভারতকে 'হিন্দুস্তান' শব্দে চিহ্নিত করেছিলেন। (৬) গজনীর সুলতান মামুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারতকে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেছিলেন। তাঁর সভাকবি আলবেরুনী (জন্ম ৯৭৩ খ্রিঃ) রচিত কিতাব-উল-হিন্দ বা তহকক-ই-হিন্দ গ্রন্থে 'হিন্দ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইতিহাসের সূত্রে আরো জানা যাচ্ছে যে, ভারতের বাইরে ইরান-পারস্য-

গ্রিসের লেখকদের গ্রন্থে ও শিলা-লেখে 'হিন্দু' বা 'হিন্দুস্তান' শব্দ ব্যবহৃত হলেও ভারতের মাটিতে তখন 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হত না। তখনকার ভারতীয়রা বিদেশিদের দেওয়া 'হিন্দু' নাম গ্রহণ করেনি। ভারতে আরবিয়ান মুসলমানদের শাসনকাল ১২০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত। এই সময়কালে মুসলমান শাসকদের দলিল-দস্তাবেজে ও সরকারি নথিতে ভারতীয়দের কিংবা অ-মুসলমানদের 'হিন্দু' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মুসলমান শাসনের আগে ভারতের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সরকারি নথিতে, দলিলে ও বই-পত্রে বা শিলা-লেখে, ধর্মগ্রন্থে কোথাও লিখিতভাবে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয়নি।

'হিন্দু' শব্দ সম্পর্কে তাই সুস্পষ্টভাষায় বলা যায় ঃ (১) শব্দটি ভারতীয় শব্দ নয়, বিদেশি পারসিক-গ্রিক-মুসলমানদের দেওয়া শব্দ। (২) 'হিন্দু' শব্দটি ফারসী শব্দ, অর্থাৎ ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারে তা বহিরাগত শব্দ বলেই ধৃত।

আর্য-ব্রাহ্মণরা কবে থেকে 'হিন্দু' নাম ধারণ করেছে

মুসলিম রাজত্বের (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) আগে সেন রাজত্ব পর্যন্ত আর্য বা অনার্য কোনো গোষ্ঠীই নিজেদের 'হিন্দু' বলে মনে করত না। সেন আমল (১০৫০—১২০০ খ্রিঃ) পর্যন্ত রচিত কোনো গ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দ নেই। 'হিন্দু' নামে কোনো সভা, সমিতি, সংগঠন, পত্র-পত্রিকা, বই সেন আমল পর্যন্ত তৈরি বা রচিত হয়নি। আর্যরা তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নামে পরিচিত ছিল। বিপরীতে অনার্যরা বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রকৃতি নামে চিহ্নিত ছিল। আর্যরা অবশ্য তাদেরকে দাস, দস্যু, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নিচুজাত বলেই কটাক্ষ করত। তবে 'হিন্দু' পরিচিতি কারোর মধ্যেই প্রচলিত ছিল না। ভারতে মুসলিম রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর মুসলমান শাসকগণ অমুসলমান ভারতীয়দের লিখিতভাবে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' নামে অভিহিত করেন। সরকারি নথি ও দলিল-দস্তাবেজে তাঁরা ভারতীয়দের 'হিন্দু' হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। প্রশাসনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ও আর্য-বর্গের কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ করতে থাকেন।

বলা বাহুল্য, আর্যদের মধ্যে 'হিন্দু' পরিচিতি গ্রহণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। মুসলমান আমলে জন্ম নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রিঃ) আর্য ছিলেন না। তিনি 'হিন্দু' নাম গ্রহণ করেননি। তাঁর ধর্মের নাম 'শিখ'। বাঙলার ব্রাহ্মণ সন্তান নিমাই মিশ্র ওরফে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রিঃ) 'হিন্দু'-র পরিবর্তে 'বৈষ্ণব' নাম ধারণ করেন। এ ছাড়া, মুসলমান আমলে জন্ম রবিদাস (মুচি), কবীর (মুসলিম), সোনা (নাপিত), সাধন (কসাই), রামানন্দ (ব্রাহ্মণ) —এঁরা কেউই 'হিন্দু' নামে ধর্ম প্রচার করেননি। বৌদ্ধবিরোধী শংকরাচার্যও (৬৮৬-৭১৮) হিন্দু নাম নেননি। তবে মুসলিম আমলে অনেক ব্রাহ্মণ ও মুসলমান কবিদের কাব্যে আবার 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষকদের অভিমত, ভারতীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মণ কবি বিদ্যাপতিই তাঁর 'কীর্তিলতা' কাব্যগ্রন্থে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দে নিজেদের জাতকে চিহ্নিত করেছেন। আনুমানিক ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতকের (১২৫০—১৩৫০ খ্রিঃ) মাঝামাঝি সময়ে বিহারের মৈথিলী জেলায় বিদ্যাপতির জন্ম। তাঁর পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণ কবিও তাঁদের কাব্যে আর্যদের আত্মপরিচিতি স্বরূপ 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

মুসলমান আমলে কোন কোন ভারতীয় কবি নিজেদের 'হিন্দু' বলতে শুরু করেন, তার একটি তালিকা এরূপ—

(১) বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা' কাব্যগ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

হিন্দু তরকে মিললো বাস,/একক বর্ম্মে অওকো উপবাস।
কতহুঁ বাঙ্গ কতহুঁ বেদ, / কতহুঁ মিলমিশ কতহুঁ ছেদ।।

অর্থ ঃ হিন্দু ও তুর্কি মুসলমানরা একসঙ্গে বসবাস করে। একের ধর্মে অন্যে উপহাস করে। কেউ আজান দেয় কেউ বেদ পড়ে। কারো সমাজে মেলামেশা আছে, কারো সমাজে প্রভেদ।

বুঝতে অসুবিধা নেই যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান সমাজে নিজেদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা-আত্মীয়তা ছিল, জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুসমাজে জাতিভেদ থাকবার জন্য অবাধ মেলামেশা ছিল না। বিশেষ করে শূদ্রের ছায়াও পর্যন্ত মাড়াত না ব্রাহ্মণরা।

(২) বৈষ্ণব পদকর্তা বৃন্দাবন দাস জাতিতে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও বিষ্ণুর পূজারি হওয়ার জন্য নিজেকে 'দাস' বলতেন। 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে ব্রাহ্মণজাতিকে উদ্দেশ্য করে 'হিন্দু' সম্বোধন করেছেন—

হিন্দু কুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ,
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম,
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

অর্থঃ হিন্দু জাতিভুক্ত কোনো ব্রাহ্মণ মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের ধর্মকে মারছে, নিজেও মরছে।

(৩) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বলেছেন—

হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল।
নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল।।

(৪) পঞ্চদশ শতকের (১৪০১—১৫০০ খ্রিঃ) মঙ্গল কাব্যের কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে বলেছেন—

কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত
তাদের সম্মুখে নাই হিন্দুয়ানী রীত।।

অর্থ ঃ মুসলমানদের কাজীরা (বিচারক) হিন্দুরীতি জানতেন না।

(৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে বৈষ্ণবদের কীর্তনের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুসলমান কাজী (বিচারক) বলেছেন—

এতকাল নাহি কেন কৈল হিন্দুয়ানি।
একে উদ্যমে চালাও কোন বল জানি।।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণদের রচিত কাব্যে 'হিন্দু' পরিচিতি এসে গেছে।

হুমায়ন (১৫৩০—১৫৩৯ খ্রিঃ) ও শেরশাহের (১৫৪০—১৫৪৫ খ্রিঃ) আমলের মুসলিম কবি মালিক মহম্মদ জায়সী 'পদুমাবৎ' কাব্যে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন—'বৃক্ষ লাগি এক ভাই দুই ডারা, / আহ রহতি নানা প্রকারা, মাটু কে বকত, পিতাকে বিন্দু, কহলাবে তুরুক অউ হিন্দু।'

অর্থ ঃ হিন্দু-মুসলমান একই বৃন্তে দু'টি ফুল।

কাজেই, আমরা দাবি করতে পারি, মুসলমান আমলেই আর্যদের একাংশ মুসলমানদের দেওয়া 'হিন্দু' নাম ধারণ করতে শুরু করেছিল। যদিও তখন হিন্দু শব্দটি ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়নি।।

পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত হিন্দুদের

ভারতীয় সংবিধানে 'ভারত' (Bharat) শব্দের প্রতি শব্দ হিসেবে 'ইন্ডিয়া' (India) শব্দটি গৃহীত হয়েছে। 'হিন্দুস্তান' শব্দটি গৃহীত হয়নি। এটা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে স্বঘোষিত ভারতপ্রেমী হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে। তাদের দাবি, 'পাকিস্তান' শব্দটি যদি পাশাপাশি গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে 'হিন্দুস্তান' শব্দটি কেন গ্রহণ করা যাবে না?

হিন্দুত্ববাদীদের এই দাবি নস্যাৎ করা যায় না। কারণ, 'ইন্ডিয়া' শব্দটি গ্রহণ করে তো ব-কলমে 'হিন্দুস্তান' শব্দকেই মান্যতা দেওয়া হল। তাহলে সরাসরি 'হিন্দুস্তান' শব্দের প্রয়োগে আপত্তি কোথায়? যদি 'কমিউনিস্ট পার্টি অব হিন্দুস্তান' বলা হয় তাহলে অসুবিধা কোথায়? ভারতকে 'ইন্ডিয়া' বলার অর্থ ঘাড় ঘুরিয়ে 'হিন্দুস্তান'ও বলা। কারণ, হিন্দু, হিন্দুস্তান, ইন্ডিয়া প্রভৃতি শব্দের উৎসমূল এক —'হিদুষ'। শুধু ভাষাগত পার্থক্য, উচ্চারণগত পার্থক্য তেমন নেই।

ইতিহাসের সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, "২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানিয়া শাসকের একটি শিলালেখতে সর্বপ্রথম লিখিতভাবে 'হিন্দুস্তান' শব্দটি পাওয়া যায়। দশম শতকের শেষভাগে অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত 'হুদুদ অল্ আলম' গ্রন্থেও 'হিন্দুস্তান' শব্দ দ্বারা সমগ্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে। (দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ৭ম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্য পুস্তক 'অতীত ও ঐতিহ্য', অক্টোবর ২০১২)।

ঘটনা হল, বর্তমান হিন্দুত্ববাদীরা যে ভারতকে 'হিন্দুস্তান' নামে অভিহিত করতে চাইছে এবং সংবিধানে তা প্রয়োগ করতে চাইছে, বহুকাল আগে পারসিক-গ্রিক-মুসলমানরাই সেই কাজটি বাস্তবায়ন করে গেছে। হিন্দুত্ববাদীদের এই দাবি তো নিজেদের দেশজ মাটির থেকে উদ্ভাবিত নয়, তার উদ্ভব তো বিদেশের মাটিতেই। অতএব, 'হিন্দুস্তান' শব্দের দাবিদারদের উচিত বিদেশি পারসিক-গ্রিক-মুসলমানদের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানানো। পিতা-মাতারাই তো সন্তানের নামকরণ করেন। ভারতীয়দের 'হিন্দু' বা 'ইন্ডিয়া' বলে পারসিক-গ্রিক-মুসলমানরা কার্যত সেই দায়িত্বই পালন করেছে। ভারতীয়রা যদি সত্যিই বিদেশিদের নামকরণ বাতিল করতে চায় তাহলে ভারতের দেশজ কোনো শব্দ-পরিচিতি খুঁজে বের করা দরকার।

ব্রাহ্মণরা নিজেদের ‘আর্য’ পরিচিতি ত্যাগ করে মুসলমান প্রদত্ত ‘হিন্দু’ নাম ধারণ করেছিল কেন

কোনো ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষ সাধারণত নিজেদের বংশগত, অঞ্চলগত বা দেশগত পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকে। বিদেশিদের দেওয়া নামে এবং বিশেষ করে প্রতিপক্ষের দেওয়া নামে কেউ পরিচিত হতে চায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণের লোকদের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনা দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের সুপ্রাচীন ‘আর্য’ পরিচিতি ত্যাগ করে মুসলমান প্রদত্ত ‘হিন্দু’ পরিচিতি ধারণ করেছে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির মধ্যে এই ডিগবাজি ঘটেছিল তা আবিষ্কার করা দরকার।

ভারতে বহিরাগত পাঠান-মুঘল মুসলমানদের রাজনৈতিক শাসনের সময়কাল মোটামুটি ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আফগান সম্রাট মহম্মদ ঘুরীর দিল্লি দখল ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ। তারপর ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবকের অনুচর ইখতিয়ার উদ্দীন বিন বখতিয়ার খলজির বাঙলা দখল ১২০৫/০৬ খ্রিস্টাব্দ। এরপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে বাঙলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পলাশী যুদ্ধ। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত।

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান রাজত্ব শুরুর আগে দিল্লির চৌহান রাজত্ব (ব্রাহ্মণ) বা বাঙলার সেন রাজত্ব (ক্ষত্রিয়) পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য বর্ণের লোকেরা কেন্দ্রীয়ভাবে ‘আর্য’ নামেই পরিচিত ছিল। মুসলমান রাজত্বের আগে রচিত বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ-পুরাণ-মনুসংহিতা-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ত্রিপিটক-কালিদাস রচনাবলী— কোথাও ‘হিন্দু’ শব্দ নেই। সর্বত্রই তারা ‘আর্য’ নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া, আর্য-বহির্ভূত মূলনিবাসীদের পরিচিতি ছিল সনাতনী, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, অসুর ইত্যাদি। অহংকারী হিংসুক আর্যরা এদেরকে দাস-দস্যু চণ্ডাল-ম্লেচ্ছ-শূদ্র-নিচুবর্ণ-কালো চামড়া ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করত। এদেরকে ‘অনার্য’ও বলা হত যেহেতু এরা আর্য নয়। আর্য বা অনার্য কোনো গোষ্ঠীই ‘হিন্দু’ নামে পরিচিত ছিল না। তবে ভারতে মুসলমান রাজত্ব কায়েমের এক- দেড় হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব কালে অথবা প্রথম-দ্বিতীয় তৃতীয়

শতকের দিকে বিদেশের (ইরান-পারস্য-আফগানিস্তান-গ্রিস প্রভৃতি) মাটিতে 'হিন্দু' বা ইন্ডিকা- ইন্ডিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। বিদেশের লোকেরা ভারতীয়দের 'হিন্দু' ও ভারতকে 'ইন্ডিয়া' বলত। ঘটনা হল, ভারতে মুসলমান রাজত্ব কায়েম হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের আর্য-অনার্য কোনো গোষ্ঠীর লোকেরা বিদেশিদের দেওয়া 'হিন্দু' বা ইন্ডিকা / ইন্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করেনি। এ কারণে, এদের রচিত কোনো গ্রন্থে হিন্দু বা ইন্ডিয়া শব্দ নেই। 'ইস্ট-ইন্ডিয়া' শব্দটি বিদেশি ব্রিটিশের শব্দ, এই কোম্পানিও তাদের।

ভারতের মাটিতে 'হিন্দু' শব্দের প্রথম লিখিত প্রয়োগ শুরু মুসলমান রাজত্বে (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) আর 'ইন্ডিয়া' (India) শব্দের প্রথম লিখিত প্রয়োগ ব্রিটিশ রাজত্বে (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ)। অবশ্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে জর্জ হোয়াইট ও জন ওয়ার্ডসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি। বিদেশেই 'ইন্ডিয়া' শব্দ প্রথম প্রয়োগ হয়। মুসলমান শাসকগণ তাদের প্রশাসন কার্যের নথিতে বা দলিল দস্তাবেজে ভারতের অ-মুসলমানদের 'হিন্দু' নামে নথিভুক্ত করতে থাকেন। তা দেখাদেখি ব্রাহ্মণ কবি-লেখকদের একাংশও 'হিন্দু' শব্দ গ্রহণ করতে থাকেন। মৈথিলী (বিহার) ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির কাব্যে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তারপর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ঘনারাম চক্রবর্ত্তী সহ বিভিন্ন কবিদের মঙ্গলকাব্যেও 'হিন্দু' শব্দ প্রয়োগ হতে থাকে। পাশাপাশি 'আর্য' শব্দও ছিল। এঁরা মুসলমান আমলের কবি।

মুসলমান আমলে মুসলমান সরকার মূলত দুটো কারণে 'জিজিয়া কর' প্রবর্তন করেছিল ঃ (১) সরকারি কোষাগার পূর্ণ করা এবং (২) কূটকৌশলে ইসলামে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ভারতে মুসলমান সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটানো। সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ (১) যারা মুসলমান তাদের নিকট থেকে 'জিজিয়া কর' নেওয়া হবে না। (২) অতীতে বা বর্তমানে বিদেশ থেকে ভারতে আগত লোকদের নিকট থেকে 'জিজিয়া কর' নেওয়া হবে না। (৩) জিজিয়া কর নেওয়া হবে শুধুমাত্র ভারতের মূলনিবাসী অনার্যদের (বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, অস্পৃশ্য প্রভৃতি) নিকট থেকে (৪) তবে এরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাবে।

মুসলমান সরকারের এই ঘোষণার পরে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা বলল, 'আমরা 'আর্য' আমরাও বহিরাগত'। ফলে জিজিয়া কর থেকে তারা মুক্তি পেয়ে গেল। পাশাপাশি অনার্যবর্গের কিছু লোক মুসলমান হয়ে জিজিয়া কর থেকে মুক্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণদের কিছুলোক আবার মুসলমান মন্ত্রীসভায় ও সরকারি দপ্তরে

চাকরি করার লোভে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, শুধু ইসলামকে 'ভালোবেসে' ব্রাহ্মণ বা দলিতরা মুসলমান হয়েছিল, ইতিহাস তা বলে না।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, মুসলমান রাজত্ব পর্যন্ত 'হিন্দু' শব্দটি আর্যদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেও তারা 'আর্য' পরিচিতিটা ত্যাগ করেনি। কিন্তু পরবর্তী ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রাহ্মণরা সেই 'আর্য' পরিচিতি আর ধরে রাখতে পারলো না। তারা ডিগবাজি খেয়ে মুসলমান প্রদত্ত 'হিন্দু' পরিচিতি নিজেরা তো ধারণই করলো, উপরন্তু অনার্য-শূদ্রদের (SC-ST-OBC) গায়েও 'হিন্দু' তকমা লাগিয়ে দিল। প্রশ্ন হল আর্য-ব্রাহ্মণরা এভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেল কেন? কেন তারা প্রতিপক্ষ মুসলমানদের দেওয়া 'হিন্দু' নাম ধারণ করলো? এবং কেন অনার্য শূদ্র-বৌদ্ধদের গায়ে 'হিন্দু' তকমা লাগিয়ে দিল?

প্রবাদ আছে, 'গুতোয় পড়লে ছুঁচোয় নমাজ পড়ে'। ব্রিটিশ আমলে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, ব্রাহ্মণরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই 'হিন্দু' নাম ধারণ করেছিল। কী সেই পরিস্থিতি?

আমরা সকলেই জানি, ভারতে মুসলমান রাজত্ব পর্যন্ত ভারতীয় ভূখণ্ডের বা জনগোষ্ঠীর কোনো ইতিহাস রচিত হয়নি। নৃতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক কোনো ইতিহাস ছিল না ভারতীয়দের। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশপ্রশাসন সেই কাজে সর্বপ্রথম হাত দেয়। ব্রিটিশের শাসন ব্যবস্থা ছিল ঔপনিবেশিক। অর্থাৎ, তাদের শিকড় ছিল ব্রিটেনের মাটিতে। মূল শাসক থাকত সেখানেই। ভারতে তাদের শাখা-প্রশাখা শাসক রেখে দিয়ে আর্থিক মুনাফা নিয়ে যেত ব্রিটেনে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন ছিল ব্রিটিশের। ফলে সেখানে লাগতো প্রচুর সেনা, লোক-লস্কর। ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেই সমস্ত দেশে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল ব্রিটিশ। তাছাড়া ভারত থেকে প্রচুর কাঁচামাল ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরির জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এতে দেশীয় শিল্পমালিক, শ্রমিক, কৃষকরা বঞ্চিতই হয়ে যাচ্ছিল তাদের নিজেদের আয়-উপার্জনের ক্ষেত্রে। ভারতীয়দের ভেতরে ক্রমশ বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের সুর উঠছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন দেখল যে কোনো মূল্যে এইসব বিরোধিতা দমন করতে হবে। তারাও প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, শুধু ব্রিটিশ শাসকরা বিদেশি নয়, তার আগে এদেশে আর্য-মুসলমান দুই শাসকগোষ্ঠীও বিদেশি শাসক ছিল। অতএব, ব্রিটিশকে 'বিদেশি' বলে অন্য দুই বিদেশি (আর্য-মুসলমান) গোষ্ঠী কথা বলতে পারে না।

ভারতের প্রকৃত ইতিহাস কী, এ দেশের মূলনিবাসী কারা, ভারত কবে থেকে বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত ও শাসিত, আজ যারা (আর্য-মুসলমান) নিজেদের

'ভারতীয়' বলে দেশপ্রেমের কথা বলছে এবং ব্রিটিশ শাসনকে ঔপনিবেশিক (Colonial) শাসন বাল লোক ক্ষ্যাপাতে চাইছে সেই তারাও (আর্য-মুসলমান) কি এ দেশের ভূমিসন্তানদের (SC-ST-OBC) উপর সুবিচার করত? —এসব ইতিহাস রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশে ব্রিটিশ সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর দ্বারা ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে কলকাতায়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক অফিসার ভারতে চাকরি করতে এসেছিলেন। তাঁরা ক্রমশ এই সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং ভারতের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূখণ্ড, অতীত ঘটনাবলী প্রভৃতি চর্চায় আত্মনিবেশ করেন। ১৮২৯ সালের দিকে কিছু ভারতীয় পণ্ডিত, গবেষকও এই সোসাইটিতে যোগদান করেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং পরে আরো গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয় ব্রিটিশের উদ্যোগে। আর্য-ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত দেব-দেবী-ভাষা-সংস্কৃতি, বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ, ব্রাহ্মণদের রক্তগত সম্পর্ক ইত্যাদি গবেষণার মাধ্যমে ক্রমশ প্রমাণিত হয় যে, আর্যরাও বিদেশি। সিন্ধু-হরপ্পার ইতিহাস, বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, মৌর্যরাজত্ব বুদ্ধ-মহাবীর-অশোকের ইতিহাস, অশোকস্তম্ভ, অজন্তা-ইলোরা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, নালন্দা, রক্তমৃত্তিকা, সোমপুরী প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি ইতিহাস উদ্ধার ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রমাণিত হয় যে, আর্য ও মুসলমান উভয়ই বিদেশি জনগোষ্ঠী। অতএব, ইংরেজরা বিদেশি, এই দাবি তুলে চিল্লামিল্লির যুক্তি নেই বলে দাবি করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন।

ভারতের মূলনিবাসী জনপদকে (SC-ST-OBC) কোনো অধিকার দিত না আর্য-মুসলমান জোট বহিরাগত শক্তি। শুঙ্গ, গুপ্ত, সাতবাহন, সেন, মুসলিম যুগে ভারতের মূলনিবাসী জনপদ যারা বৌদ্ধ-জৈন-শূদ্র-অসুর নামে পরিচিত ছিল তারা কোনো অধিকার পেত না। ইংরেজ সরকার সেই মূলনিবাসী জনপদকে কাছে টানার জন্য এদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে উদ্যোগ নেয়। এবং এদেরকে বোঝাতে চায় যে, এতদিন তোমরা যাদের দ্বারা শাসিত শোষিত হয়ে এসেছ তারাও তো বিদেশি।

শিক্ষার আলোয় প্রবেশের ফলে মূলনিবাসীরাও ক্রমশ জানতে-বুঝতে পারে যে, ইংরেজদের ন্যায় আর্য-মুসলমানরাও বিদেশি শাসকজাতি। মূলনিবাসীরা ক্রমশ তাদের অতীত ইতিহাস, বৌদ্ধ, হরপ্পা, সনাতন ধর্মের ইতিহাস, তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি জানতে সক্ষম হয়। এর ফলে, আর্যদের সঙ্গে দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পায় মূলনিবাসীদের। এমনতর পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণরা দেখল, 'আর্য'

পরিচিতি ধারণ করা আর সঠিক কাজ হবে না। 'আর্য' মানেই বহিরাগত, বিদেশি — এটাই প্রচারিত হয়েছিল জনমানসে। ব্রিটিশরাই এই কাজটি করেছিল। তাই, আর্য-ব্রাহ্মণরা ক্রমশ 'হিন্দু' পরিচিতি ধারণ করে মূলনিবাসী সাজতে চাইলো এবং বৃহত্তর অর্থে অনার্য-দলিত সমাজকেও কাছে টানতে চাইল যাতে 'হিন্দু' সংখ্যার বৃদ্ধি দেখানো যায়। ভেতরে রয়ে গেল সেই বৈদিক বর্ণব্যবস্থা, উঁচু-নিচু জাতিভেদ প্রথা। কিন্তু উপরে উপরে সবাই 'হিন্দু' পরিচিতি দেখিয়ে ব্রিটিশ ও মুসলমানদের বোঝাতে চাইলে যে, হিন্দুরাই ভারতের মূলনিবাসী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ।

মোট কথা, 'আর্য' পরিচিতিতে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্ণের লোকেরা বিদেশি বা বহিরাগত তকমা পেয়ে যাচ্ছিল। এই তকমা থাকলে বিদেশি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, অনার্যদের (SC-ST-OBC) সাথে নিয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনও করা যাবে না। তাই তড়িঘড়ি 'হিন্দু' পরিচিতি ধারণ করে ব্রাহ্মণরা মূলনিবাসী বা স্বদেশি সাজতে চেয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, এই 'আর্য' তথা 'বিদেশি' তকমা দেখিয়ে মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা 'জিজিয়াকর' থেকে ছাড় পেতে চেয়েছিল। তারাই আবার ব্রিটিশকে বিদেশি বানানোর ধান্দায় নিজেরা সাজছে স্বদেশি।

ব্রাহ্মণরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে 'হিন্দু' তকমা দিল কেন

আমাদের অর্থাৎ তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) পূর্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন না। তাঁরা প্রাক-আর্য ভারতে সনাতন ধর্মী ছিলেন। পরে বৌদ্ধভারতে বৌদ্ধ ধর্মী ছিলেন। বর্তমান ভারতে আমরা (SC-ST-OBC) অর্থাৎ বৌদ্ধদের উত্তর-সূরীগণ নিজেদের হিন্দু বলে মনে করি এবং অনেকেই পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ইতিহাস জানি না। কোনো শিশুর মন থেকে তার মা-বাবা ও জন্মস্থানের নাম ঠিকানা ভুলিয়ে দিতে পারলে সেই শিশু অনাথ হয়ে পড়ে। তার উপর যা খুশি অত্যাচার করা যায়। তাকে গোলাম—দাস হিসেবে কাজে লাগানো যায়। আমাদের অবস্থাও সেরূপ। আমরা যখন বৌদ্ধ ছিলাম তখন স্বাধীন ছিলাম। সমাজে নিচুজাত রূপে ঘৃণিত ছিলাম না। আমাদের সামাজিক কাজকর্মে ব্রাহ্মণ ছিল না। কোনো কুসংস্কার ছিল না। কিন্তু এখন হিন্দুধর্মে আমরা শূদ্র, নিচুজাত রূপে চিহ্নিত। ব্রাহ্মণ উঁচুজাত। আমাদের কাজ ব্রাহ্মণসেবা, ব্রাহ্মণ তোষণ। আমরা

ব্রাহ্মণকে উঁচুবর্ণ বলে শ্রদ্ধা করে, তাকে চাল-কলা-খাট-বিছানা-জুতো-সোনা-গাভী-প্রণামী দান করে ব্রাহ্মণসেবা করে চলেছি। গীতা ও মনুসংহিতার নির্দেশ মেনে চলেছি আমরা।

যে কোনো ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস টিকিয়ে রাখতে গেলে রাজক্ষমতার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে অর্থনৈতিক ক্ষমতারও। প্রাক-আর্য ভারতে যে প্রকৃতি তথা সনাতন ধর্ম ছিল তা ধরাশায়ী হয়েছে আর্য-আক্রমণে ও তাদের শাসনে। আর্যরা রাজক্ষমতা পেয়ে প্রাক-আর্য ভারতের সনাতন ধর্মীদের বিভিন্ন অধিকার কেড়ে নিতে থাকে। সনাতন ধর্মীদের একটা অংশ সেদিন আর্যদের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর্যরা তাদেরকে দাস হিসেবে শূদ্র বর্ণে পতিত করে রাখে। কোনো অধিকার ছিল না শূদ্রদের। কিন্তু সনাতন ধর্মীদের আর একটা অংশ আর্যদের পদানত না হয়ে আর্য-রাজত্বের বাইরে চলে যায়। আর্যরা তাদেরকে 'দস্যু' বলে চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে স্বাধীনচেতা সেই সনাতন ধর্মীরা বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের নামে সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটায়। যেমন কংগ্রেস পার্টির একাংশ তৃণমূল কংগ্রেসের নামে পার্টি তৈরি করে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয় পশ্চিমবঙ্গে। সনাতন ধর্মীরাও বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের নামে সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে আর্যদের বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মকে কোণঠাসা করে দেয়।

মগধে মৌর্য রাজারা যতদিন ক্ষমতাবান ছিলেন এবং বাঙলায় পাল রাজগণ যতদিন ক্ষমতাবান ছিলেন, ভারতে ততদিন বৌদ্ধ ধর্ম স্বমহিমায় ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শুঙ্গ-গুপ্ত-সাতবাহন-সেন প্রভৃতি রাজনীতির প্রভাবে বৌদ্ধধর্মী রাজাদের পরাজয় ঘটে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধকেও অবতার বলে আত্মসাৎ করে এবং বৌদ্ধরীতির বেশিটাই ধ্বংস করে দেয়। বৌদ্ধ মঠ ও শিক্ষালয় ধ্বংস করে বৌদ্ধদের গায়ে চোর, ম্লেচ্ছ তকমা লাগিয়ে দেয়। শিক্ষার অধিকার হরণ করে নেয়। বৌদ্ধরা ক্রমশ অনাথ জনগণে পরিণত হয়। বৌদ্ধ আর বৌদ্ধ নামে থাকলো না, আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মের কাছে তারা 'ম্লেচ্ছ' তকমা পেয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের পরে ইসলামপন্থী মুসলিমী শাসনের যুগেও বৌদ্ধরা ম্লেচ্ছ তকমা থেকে রেহাই পেল না।

মুসলিম রাজত্বের পরে ভারতে এল ইংরেজ রাজত্ব। সেনাবাহিনিতে সেনা নিয়োগ, অফিসে অধোস্তন কর্মচারি পদে লোক নিয়োগ এবং খ্রিস্টধর্মে লোক-বৃদ্ধি ঘটাতে ব্রাহ্মণ-কথিত অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ সমাজে শিক্ষার প্রবেশ ঘটায় ব্রিটিশ। শাপে বর। ব্রাহ্মণরচিত হিন্দুশাস্ত্রে ম্লেচ্ছের শিক্ষার অধিকার নেই। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো ব্রাহ্মণ সমাজ ও তাদের কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-হিন্দু মহাসভার মতন

সংগঠনগুলো। পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের সামাজিক রীতির সংশোধনে হাত দিয়েছিল ইংরেজ। যেমন সতীদাহ বিলোপ আইন (১৮২৯), বিধবা বিবাহ চালু (১৮৫৬), বাল্যবিবাহ রদ, বহু বিবাহ রদ, বিদেশগমনে ছাড়পত্র, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি। হিন্দুমতে এগুলো হিন্দু ধর্মবিরোধী কাজ। ব্রাহ্মণ সমাজ তখন ইংরেজদের হাত থেকে রাজক্ষমতা নিজেদের হাতে আনবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করল। তারই ফলশ্রুতি ১৯১৬ সালে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণনেতা বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে 'হোমরুল লিগ' বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূত্রপাত।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু। বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকবার জন্য বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল ইংরেজ। ফলে, সমগ্র ভারতকে পরিচালনা করার মত পরিকাঠামো তাদের ছিল না। স্বায়ত্ত শাসন বিষয়টিকেও তারা নাকচ করতে পারলো না। এই উদ্দেশে ক্রমশ ১৯১৭/১৮ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড কমিটি, ১৯১৮/১৯ সালে সাউথবরো কমিটি, ১৯২৮/২৯ সালে সাইমন কমিশন, ১৯৩০/৩১/৩২ সালে গোলটেবল বৈঠকের আয়োজন করে ব্রিটিশ সরকার। ব্রাহ্মণসমাজ ও তাদের ডান-বাম-রাম দলগুলো চায়নি এই স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনে ম্লেচ্ছ তথা নির্যাতিত শ্রেণি (ডিপ্রেসড) জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু দেখা গেল, প্রতিটি কমিশন বা বৈঠকে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ শ্রেণির পক্ষ থেকে ভোটাধিকার, পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার ইত্যাদি জানানো হল। আম্বেদকরের নেতৃত্বে সর্বত্রই অস্পৃশ্যদের জোরদার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেস মঞ্চ বা দল মূলত ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় বেশি মনোযোগী ছিল। মুসলমান ও দলিতদের বিষয়ে ছিল তীব্র উপেক্ষা। মুসলমান সমাজ তার সমুচিত জবাব দিল। ১৯০৬ সালে ঢাকায় আগা খাঁ ও সলি মুল্লার নেতৃত্বে তৈরি হল মুসলিম লিগ পার্টি। এই পার্টি মুসলিমদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব দাবি করল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালে মুসলমানদের সেই অধিকার প্রদান করে। অস্পৃশ্য-দলিতসমাজও আম্বেদকরের নেতৃত্বে একই দাবি জোরদার করে তোলে সাউথবরো কিংবা সাইমন কমিশনে। গোলটেবল বৈঠকের প্রথম বছরে (১৯৩০) লন্ডনে এই ধরনের দাবি জোরালো করে তোলেন আম্বেদকর ও শ্রীনিবাসন দুই দলিত নেতা। এর ফলে, ভীত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ সমাজ। হিন্দুমহাসভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মদনমোহন মালব্য ১৯২৩ সালে উত্তর প্রদেশের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় সম্মেলন করেন। সেই সম্মেলনে ব্রাহ্মণ সমাজের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, মুসলমান জনসংখ্যাকে প্রতিহত করতে গেলে হিন্দু সংখ্যার বৃদ্ধি দেখাতে হবে। এবং সে কারণে অস্পৃশ্যদের হিন্দু বলে মেনে নিতে হবে।

কার্যত, ১৯৩১ সালের সেনসাসে (জনগণনা) অস্পৃশ্যদের গায়ে সর্বপ্রথম 'হিন্দু' তকমা দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, এবার থেকে অস্পৃশ্যরাও 'হিন্দু' লিখতে পারবে। বলাবাহুল্য, সরকারিভাবে এই তকমা পাওয়ার বহু আগে থেকেই অস্পৃশ্য সমাজের বহু গোষ্ঠী 'হিন্দু' স্বীকৃতি পেতে উঁচুজাত হওয়ার আন্দোলন করছিল। পৈতে যজ্ঞ, দশ-বারদিন অশৌচপালন, বাড়িতে ব্রাহ্মণদ্বারা পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্ম করানো—ইত্যাদি রীতি পালনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯০০ সালের আগে থেকেই।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, মুসলমান আমল (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) থেকে আর্য-ব্রাহ্মণরা মুসলিমদের দেওয়া 'হিন্দু' তকমা ধারণ করতে শুরু করেছে। পরবর্ত্তী ব্রিটিশ আমলের (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ) শেষ দিকে 'হিন্দু' একটি ধর্মীয় পরিচিতি পেয়েও গেছে। কিন্তু তবুও অস্পশ্য নির্যাতিত শ্রেণিকে তারা 'হিন্দু' বলে মেনে নিতে চাইছিলো না। জাতবর্ণ প্রথা থাকার কারণে ব্রাহ্মণ হিন্দু, অস্পৃশ্যরাও হিন্দু—এই সম-পরিচয় ব্রাহ্মণদের কাছে সন্মানজনক ছিল না। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। আর্য-ব্রাহ্মণরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার স্বার্থে অস্পৃশ্য দলিতশ্রেণির গায়ে ১৯৩১ সালে 'হিন্দু' তকমা লাগিয়ে দিল ও অস্পৃশ্যদের হিন্দুভুক্ত করবার জন্য অস্পৃশ্যদের বাড়িতে পৌরোহিত্য প্রথা প্রবর্তন করলো।

মূলত কয়েকটি কারণে অস্পৃশ্যদের গায়ে 'হিন্দু' তকমা দেওয়া হয়েছিল ঃ (১) আম্বেদকর প্রমুখ দলিত শ্রেণির নেতৃত্বে দলিত সমাজের পৃথক পরিচিতি ও পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। এই দাবি কার্যকরী হলে দলিত সমাজ রাজশক্তিতে বলীয়ান হয়ে যাবে। তখন আর ব্রাহ্মণদের অধীনস্থ থাকবে না। এই আশংকায় দলিতদের গায়ে 'হিন্দু' তকমা দিয়ে নিজেদের পদানত করে রাখতে চেয়েছিল ব্রাহ্মণরা। (২) দলিতশ্রেণির মধ্যে হিন্দু ধর্মের সম্প্রসারণ ঘটলে গ্রাম-সমাজ স্তরে এবং শহর ও শহরতলীতে গজিয়ে ওঠা মন্দিরে ও পারিবারিক পুজো ইত্যাদি কর্মে দরিদ্র-মূর্খ ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য পেশা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাতে ব্রাহ্মণদের বড় অংশ আর্থিক রোজগারে উপকৃত হবে। (৩) ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতরা সংখ্যালঘু। এখন দলিত সমাজকে 'হিন্দু' তকমা দিলে হিন্দুসমাজ সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে এবং তারা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর মাতব্বরি করতে পারবে। (৪) দেশে শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণি হিসেবে গ্রামস্তরে দলিত-মুসলিম আঁতাত হচ্ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল এই জোটশক্তির বিপরীত শক্তি। এহেন দলিত-মুসলিম সম্পর্ক ভাঙবার জন্যও দলিতশ্রেণির গায়ে 'হিন্দু' তকমা দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে।

বৌদ্ধ থেকে হিন্দুতে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে আমাদের কি কি ক্ষতি হয়েছে

সর্বভারতীয় স্তরে মৌর্যযুগ (খ্রিঃ পূঃ ৩২৪ থেকে খ্রিঃপূঃ ১৮৫ পর্যন্ত) এবং পূর্বভারতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় পালযুগ (৭৫০—১০৫০ খ্রিঃ) —এই সময় কালকে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ বলা হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী হর্যঙ্ক বংশীয় সম্রাট অজাতশত্রু (৪৯৩—৪৯৫ খ্রিঃ পূঃ) সর্বপ্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন করেন বিহারের রাজগৃহে এবং অব্যবহিত পরে শিশুনাগ বংশীয় সম্রাট কালাশোক দ্বিতীয় বৌদ্ধসম্মেলন করেন বৈশালীতে। মৌর্যসম্রাট অশোক তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন করেন পাটলিপুত্রে। বর্তমান ভারত যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতির প্রভাবে হিন্দু ভারতে পরিণত হয়েছে তেমনি প্রাচীন ভারতের এই পর্বে বৌদ্ধ রাজাদের প্রভাবে দেশ বৌদ্ধ প্রভাবিত হয়েছিল। সেসময় সংখ্যালঘু আর্যসমাজ (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মী ছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলনিবাসী (অনার্য) সমাজ বৌদ্ধধর্মী ছিল। তখন ভারতে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রবেশ ঘটেনি। কারণ, বিশ্বে এই দুই ধর্মমতের উদ্ভবই হয়নি সে সময়।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন শুরু সর্বভারতীয় স্তরে শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত (১৮৫ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৫৫০ খ্রিঃ) প্রভৃতি যুগ থেকে এবং পূর্বভারতে বৌদ্ধযুগের অবসান শুরু সেন রাজাদের (১০৫০—১২০০ খ্রিঃ) সময় থেকে। শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত-সেন প্রভৃতি যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় রাজারা এবং তাঁদের পুরোহিত ব্রাহ্মণরা ব্যাপক বৌদ্ধ নির্যাতন করেন। বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস, বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক ধ্বংস, বৌদ্ধ শিক্ষালয়গুলো ধ্বংস, বৌদ্ধহত্যা, বৌদ্ধ বিতাড়ণ, বৌদ্ধ ধর্মকে ম্লেচ্ছধর্ম বলে দাগিয়ে দেওয়া—প্রভৃতি বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে এই সময়। পরবর্তী মুসলমান রাজত্বেও (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) এই নির্যাতন অব্যাহত ছিল। শুঙ্গ যুগে (খ্রিঃ পূঃ ১৮৫) ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের স্বার্থে 'মনুসংহিতা' নামক সংবিধান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেই বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ভারতের ইতিহাসে মৌর্যপরবর্তী শুঙ্গ-সাতবাহন-গুপ্ত-সেন-মুসলমান যুগকে অন্ধকার যুগ বা মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগ বলা হয়। কারণ, এই সময়কালে ভারতের মূলনিবাসী জনগণ বহিরাগত আর্য ও মুঘল-পাঠানদের ধর্ম ও রাজনীতির দ্বারা পরাধীন হয়ে যায়। মূলনিবাসী বৌদ্ধদের শিক্ষা-ধর্ম- রাজনীতি-

অর্থ সবকিছুর অধিকার কেড়ে নেয় বহিরাগত শাসকরা। বহু বৌদ্ধ মঠকে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা হয়।

বর্তমান রাজনীতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও সরকারের নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিরোধী পক্ষের অনেকেই ক্ষমতাসীন দলের আশ্রয়ে ভীড় করে। ক্ষমতাসীন রাজনীতি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে, বিরোধী পক্ষের জনগণ তাদের রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হয়।

ভারতে বৌদ্ধ থেকে হিন্দু ও ইসলামে ধর্মান্তকরণের বিষয়েও এ জাতীয় ইতিহাস বিদ্যমান। অধিকাংশ বৌদ্ধ তাদের বৌদ্ধ পরিচয় হারিয়ে ম্লেচ্ছ, অচ্ছুৎ পরিচয় পেয়েছিল। এই অবমাননাকর 'ম্লেচ্ছ' পরিচয় মুছে ফেলার জন্য এবং অন্যান্য কারণে মুসলমান আমলে (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) বহু ম্লেচ্ছ বৌদ্ধ যেমন ক্ষমতাসীন মুসলমানদের ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তেমনি কিছু লোক বৈদিক ধর্মেও ধর্মান্তরিত হয়। পরবর্তী ব্রিটিশ রাজত্বে (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ) ম্লেচ্ছ চিহ্নিত বহু জনগোষ্ঠী (বর্তমানে যারা তফসিলিবর্গ) আর্য-হিন্দু হওয়ার আন্দোলন করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি 'আর্য' তকমা পাওয়ার জন্য মনুসংহিতার নির্দেশ মত কেউ ১০ দিন অশৌচ পালন, কেউ ১২দিন, কেউ ১৫দিন অশৌচপালন বিধি চালু করে। এ ছাড়া, আর্য হওয়ার জন্য পৈতে ধারণ, ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি করা, বাড়িতে হিন্দু দেব-দেবীর পুজো প্রবর্তন, বাড়িতে ও পাড়ায় ঠাকুর ঘর বা হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। অনেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা যেমন রামকৃষ্ণ, ভারত সেবাশ্রম, বৈষ্ণব, লোকনাথ, বালক ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি শাখার সঙ্গে জড়িত হয়ে হিন্দু জাতে ওঠার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ পরবর্তী বর্তমান সময়ে এই হিন্দু হওয়ার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বারমাসে তের পার্বণ এবং হরেক দেব-দেবী মিলিয়ে আমাদের তফসিলি বর্গ (SC-ST-OBC) আজ পাকা হিন্দুতে পরিণত। ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও এতটা পুজো-পার্বণ, নামযজ্ঞ হয় না। কিন্তু শহরতলী ও গ্রামে অবস্থিত তফসিলি তথা (SC-ST-OBC) নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে রাত দিন হিন্দু অনুষ্ঠান লেগেই আছে। বিশেষ করে তফসিলিজাতি ও ওবিসিরা ব্রাহ্মণদের চেয়েও হিন্দুত্ববাদী।

ঘটনা হল, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম মনে করে 'হিন্দু' হয়ে বড়ই লাভ হয়েছে আমাদের। আমরা জাতে উঠতে পেরেছি। আমাদের সামাজিক মর্যাদা

বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ম কার্যে ব্রাহ্মণের ছোঁয়া পাওয়া, ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে জল খাওয়া, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করা, ব্রাহ্মণকে চাল-কলা-টাকা-গাভী-সোনা-খাট-বিছানা-জুতো দান করা, ইত্যাদি কাজ করে তফসিলি বর্গ (SC-ST-OBC) নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। কাজেই, বর্তমান প্রজন্ম বৌদ্ধযুগের ইতিহাস ভুলে গেছে, ভুলে গেছে নিজেদের আদি ধর্মের ইতিহাস।

এখন প্রশ্ন হল, 'হিন্দু' হয়ে আমাদের লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে। সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাচ্ছে, 'হিন্দু' হয়ে আমাদের প্রভূত ক্ষতিই হয়েছে। বিপরীতে লাভ হয়েছে আর্য-ব্রাহ্মণদের। কারণ, এর আগে ব্রাহ্মণরা তাদের সংখ্যালঘু আর্য সমাজের নেতা বা পুরোহিত ছিল। কিন্তু এখন আর্য-অনার্য উভয় সমাজের নেতা ও পুরোহিত হতে পেরেছে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের নেতা হয়েছে ব্রাহ্মণ। ধর্ম থেকে রাজনীতি, চাকরি, সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বত্রই ব্রাহ্মণ সমাজ নেতা বা পরিচালকের ভূমিকায় অবস্থান করছে।

এবার দেখা যাক, 'হিন্দু' হয়ে আমাদের কি কি ক্ষতি হয়েছে—

(১) আমাদের আত্মপরিচিতিতে ক্ষতি।। আমরা অতীতে মৌর্য যুগে ও পালযুগে 'বৌদ্ধ' ছিলাম। এটাই ছিল আমাদের সমাজের নিজস্ব পরিচয়। কিন্তু এখন আমরা (SC-ST-OBC) বিদেশিদের দেওয়া 'হিন্দু' নামে পরিচিত হয়েছি। নিজেদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-মুসলিমদের চক্রান্তে আমরা আমাদের আদি পরিচয় হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ ও জাতির কাছে এটা অত্যন্ত অবমাননাকর অবস্থা নয় কি?

(২) আমাদের আত্মসম্মানে ক্ষতি।। 'হিন্দু' পরিচিতি আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। প্রথমত, 'হিন্দু' নামটি বিদেশিদের দেওয়া ও গালাগালি বাচক এবং দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজে আমাদের (SC-ST-OBC) স্থান শূদ্র তথা নিচুবর্ণে। 'হিন্দু' শব্দটি ভারতীয় শব্দ নয়। এটা ফারসী শব্দ। এর অর্থ চোর, ডাকাত, ম্লেচ্ছ, গোলাম ইত্যাদি। বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানরাই নিন্দার্থে ভারতীয়দের 'হিন্দু' বলেছে। এহেন 'হিন্দু' শব্দ তাই মোটেই সম্মানজনক হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের সংবিধান গীতা ও মনুসংহিতার ভিত্তিতে তৈরি হিন্দু সমাজের মূল কাঠামো চারটি বর্ণ— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রথম তিনটি বর্ণ আর্য-বর্ণ। শেষোক্ত শূদ্র বর্ণ অনার্য বর্ণ মূলনিবাসী অনার্যদের যে অংশ আর্যদের বশ্যতা মেনে নিয়েছে আর্যরা তাদেরকে দাস, গোলাম হিসেবে শূদ্র বর্ণে স্থান দিয়েছে। শূদ্রীকরণের চক্রান্তটি বৈদিকযুগ থেকে শুরু। মুসলমান ও ব্রিটিশরাজত্বে শূদ্রীকরণ আরো বৃদ্ধি

পেয়েছে। আজও সেই পালা চলছে। বর্ণকাঠামো এতই শক্তপোক্ত যে, বর্ণকাঠামো থেকে বের হওয়া যাবে কিন্তু বর্ণকাঠামোর মধ্যে ঢোকা যাবে না। যেমন, শূদ্রসন্তান শম্বুক ও একলব্য যথাক্রমে উচ্চশিক্ষা ও ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছিল। তারা কিন্তু উপরের আর্য-বর্ণে স্থান পায়নি। উপরন্তু শম্বুককে খুন করেছিল রাম। আর একলব্যের ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে নিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য। এ যুগের বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, জাতিতে কায়স্থ শূদ্র। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রচারক হয়েও 'ব্রাহ্মণ' তকমা তিনি পাননি, তাঁর বংশও কেউ 'ব্রাহ্মণ' তকমা পায়নি। আমাদের তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) অবস্থাও তাই। আমরা আদিতে বৌদ্ধ ছিলাম। মাঝখানে ব্রাহ্মণরা আমাদেরকে 'ম্লেচ্ছ' বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। সেই ম্লেচ্ছ তকমা মুছে ফেলার জন্য আমরা বৌদ্ধে প্রত্যাবর্তন না করে হিন্দু ধর্মে প্রবেশ করলাম। এর ফলে, শূদ্রবর্ণে স্থান পেলাম। কারণ, উপরের তিনবর্ণে প্রবেশের অধিকার কারোর নেই। গীতার ১৮ অধ্যায়ে এবং মনু সংহিতার ছত্রেছত্রে বলা হয়েছে— শূদ্রের কাজ উপরের তিনবর্ণের সেবা করা। আমরা যতদিন বৌদ্ধ ছিলাম বা পরে ম্লেচ্ছ দশায় ছিলাম ততদিন আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আমরা ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা সহ সেবাও করতাম না। কিন্তু এখন হিন্দু হয়ে ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা তো করছিই, উপরন্তু পা ধুয়ে জল খাওয়া, ব্রাহ্মণকে প্রণাম ইত্যাদি সেবা করে চলেছি। অর্থাৎ, হিন্দুধর্মে ঢুকে আমাদের 'শূদ্রত্ব' প্রাপ্তি ঘটেছে। আমাদের এই পরিচয় নিশ্চয়ই আত্মসম্মানের পক্ষে চরমতম ক্ষতিকর অবস্থা। আমরা এখন হিন্দু হলেও এবং ব্রাহ্মণকে 'পুরোহিত' ও রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী-মুখীমন্ত্রী রূপে মেনে নিলেও ব্রাহ্মণরা কিন্তু আমাদেরকে হিন্দু হিসেবে মনে করে না, সম্মানও দেয় না। তার প্রমাণ (১) রাস্তা-ঘাটে অফিস-কাছারিতে, বিধানসভায় এসসি-এসটি চাকরিজীবী ও নেতা-মন্ত্রীদের প্রতি ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ, বঞ্চনা, অসম্মান। মেধা নেই, আম্বেদকরের সন্তান, সোনার চাঁদ, সোনার টিয়া ইত্যাদি বলে অসম্মান করা হচ্ছে। (২) সংরক্ষিত পদ অসংরক্ষিত করা, প্রাইভেটাইজেশন নীতি এনে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানো চলছে। (৩) বিবাহ ক্ষেত্রে তফসিলিদের 'ছোটজাত' বলে অসম্মান করা হয়, জাত তুলে গালাগালি চলছে। অর্থাৎ, হিন্দু হয়েও ব্রাহ্মণের সমতুল মর্যাদা ও অধিকার তফসিলিদের নেই। কোনো তফসিলি ব্যক্তি পৌরোহিত্যের অধিকার পায় না। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে—অ-ব্রাহ্মণরাও পূজারি হতে পারবে। এই রায়-এর জন্য অবদান ভারতীয় সংবিধানের। এতে হিন্দু সংবিধানের কোনো ক্রেডিট নেই। বাস্তবে

তফসিলিরা পৌরোহিত্যের অধিকার পায়না। হিন্দু ধর্মে ঢুকে আমরা শূদ্রবর্ণে স্থান পেয়েছি। এই স্থান কি সম্মানজনক?

(৩) আমাদের ধর্ম ও সামাজিক অধিকারে ক্ষতি।। আমরা যখন বৌদ্ধ ছিলাম তখন নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান নিজেরাই করতাম। পুজো বা যজ্ঞ বৌদ্ধ ধর্মে ছিল না। কিন্তু গৃহ-নির্মাণ, গৃহ-প্রবেশ, মুখেভাত, হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ, ভাইফোঁটা, বোন ফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, পুত্রবধূবরণ, বিবাহ, বিবাহ-বার্ষিকী, মরণোত্তর শ্রদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদি রীতি-নীতি বৌদ্ধ ধর্ম মতেই হত। কোনো মন্ত্রতন্ত্র, ঈশ্বর বৌদ্ধ রীতিতে ছিল না। ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য তো ছিলই না। ধর্ম ও সমাজে আমরা তখন স্বাধীন ছিলাম। কিন্তু এখন 'হিন্দু' হওয়ার ফলে ধর্মে পৌরোহিত্যের অধিকার হারিয়েছি। কোনো কাজে ছুটে যেতে হচ্ছে ব্রাহ্মণের বাড়িতে। তিনি একটি লম্বা ফর্দা লিখে দিচ্ছেন। আমরা ছুটে যাচ্ছি দশকর্মার দোকানে। সবকিছু যোগাড় করছি আমরা, ব্রাহ্মণ এসে পৌরোহিত্য করছে। আমরা যোগাড়ে, ব্রাহ্মণ রাজমিস্ত্রী, হেডমিস্ত্রী। টাকা ও চাল-কলার বিনিময়ে একজন ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করে অনুষ্ঠান করতে হচ্ছে। নিজের ভগবান বা নিজের মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করার অধিকারটুকুও নেই। কার্যত, হিন্দুধর্মে ঢুকে আমরা (SC-ST-OBC) সামাজিক ভাবে পরাধীন বা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছি।

(৪) আমাদের বিজ্ঞানচেতনায় ক্ষতি।। আমরা যখন বৌদ্ধ ছিলাম, আমাদের বৌদ্ধধর্মে কোনো ঈশ্বর, অলৌকিত্ব বা কুসংস্কার ছিল না। ঈশ্বর-আত্মা-স্বর্গ- পরজন্ম-দেব-দেবী-পুজো-মন্ত্র -বর্ণাশ্রম জাতিভেদ ইত্যাদি বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্মে ছিল না। বুদ্ধ-প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল, চার বোধসত্য—কোথাও কোনো বুজরুকি বা অন্ধ বিশ্বাস নেই। আধুনিক বিজ্ঞানেরই পূর্ববর্তী রূপ বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু হিন্দু ধর্মে রয়েছে উল্টো ভাবনা। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা রূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা হিন্দু ধর্মে করা হয়। পুজো করলে মঙ্গল হবে, আত্মার পুনর্জন্ম হবে, প্রয়াত মা-বাবার আত্মা পিণ্ড খেয়ে স্বর্গে যায়, ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞ করলে মঙ্গল হয়—এসব অন্ধবিশ্বাস হিন্দুধর্মে বিদ্যমান। আমরা উচ্চশিক্ষা বা প্রচলিত ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান—অংকশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও মন থেকে অন্ধবিশ্বাস দূর করতে পারছি না। এর প্রধান কারণ, জন্মসূত্রে মা-বাবা-বংশের কাছ থেকে প্রাপ্ত অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস আমাদের চিন্তা-শক্তিকে এবং যুক্তি ও বিচার শক্তিকে এতই দুর্বল করে রেখেছে যে, আমরা কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও, ডারউইন, ল্যামার্ক প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অবদান জেনেও বাস্তবক্ষেত্রে সেই অন্ধবিশ্বাসের শিকার। জন্মসূত্রে যদি বৌদ্ধ শিক্ষা থাকতো তাহলে অন্ধবিশ্বাস

আমাদের মনকে এভাবে বিকৃত করতে পারতো না। বৌদ্ধিক চেতনা মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে।

(৫) আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় ক্ষতি।। ধর্ম ও সাংস্কৃতিকভাবে সমাজকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারাই হয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রের শাসক। কারণ, সমাজস্তরে বসবাসকারী মানুষের সমর্থন থাকে তাদের প্রতি। তেমনি রাজনৈতিক ভাবে যারা দেশের শাসক হয় তারা নিজেদের রাজ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী বা অক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা জনগণকে প্রভাবিত করতে থাকে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্টান—সকলের ক্ষেত্রেই এই কথাগুলো সমপরিমাণে সত্য। আমরা ভারতের মূলনিবাসীরা সমাজস্তরে যতদিন বৌদ্ধ ছিলাম ততদিন বৌদ্ধ রাজাদের সমর্থন করেছিলাম। অথবা, বৌদ্ধ রাজারাও বৌদ্ধ জনগণদের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজাদের দ্বারা বৌদ্ধ রাজাদের পরাজয় এবং পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাগরণ ক্রমশ পরাধীন করতে থাকে বৌদ্ধ জনগণদের। বর্তমান সেই বৌদ্ধ বিচ্যুত ও বিস্মৃত জনগণ হিন্দুতে ধর্মান্তরিত। এর ফলে, হিন্দু হিসেবে তারা শত্রু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে নেতা-মন্ত্রী রূপে সমর্থন করে চলেছে। কারণ, ব্রাহ্মণও হিন্দু, তফসিলিরাও হিন্দু। ভেতরে উঁচু-নিচু প্রভেদ ও জাতবিদ্বেষ রয়েছে, সেটা বুঝবার ক্ষমতা হচ্ছে না তফসিলি তথা নিম্নবর্ণের শূদ্র-হিন্দুদের। ক্ষমতা যে হচ্ছে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ ব্রিটিশ আমলের একটি ঘটনা। ১৯৩০-৩১ সালে গোলটেবল বৈঠক থেকে অস্পৃশ্য-তফসিলিদের পৃথক নির্বাচনী অধিকার আদায় করেছিলেন আম্বেদকর। ওই সময়-কালে অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর বড় অংশ ম্লেচ্ছ, অস্পৃশ্য, নিচুজাত দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'হিন্দু' হওয়ার আন্দোলন করছিল। ব্রাহ্মণরা তখন চক্রান্ত করে ১৯৩১ সালের সেনসাসে অস্পৃশ্যদের গায়ে 'হিন্দু' তকমা লাগিয়ে দেয়। কংগ্রেস নেতা গান্ধি সেই সুযোগটা নিয়েছিলেন। তিনি বললেন, অস্পৃশ্যরা যদি আম্বেদকরের দাবি মতন পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা পায় তাহলে হিন্দু সমাজ ভেঙে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে। তখন অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর বহু নেতা ও লোক সে সময় আম্বেদকরের বিরুদ্ধে গিয়ে 'হিন্দু' হওয়ার লোভে গান্ধিকেই সমর্থন করেন। এর ফলে, গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে পুনাচুক্তি (২৪-৯-১৯৩২) হয়। অস্পৃশ্যরা পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা হারিয়ে যৌথ নির্বাচনী তথা রাজনৈতিক সংরক্ষণে ঢুকে ব্রাহ্মণনেতাদের পদানত হয়ে যায়। সে সময় অস্পৃশ্যদের যদি 'বৌদ্ধ' আইডেনটিটি থাকতো তাহলে গান্ধি এভাবে হিন্দুত্বের জুজু দেখিয়ে আম্বেদকরকে ঘায়েল করতে পারতেন না। সে সময়, শিখ, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো 'রা' কাড়েননি

গান্ধি। আজও তফসিলিবর্গ (SC-ST-OBC) হিন্দুভুক্ত থাকবার জন্য শত্রু ব্রাহ্মণদের তৈরি ডান-বাম-রাম দলকে ভোট দিচ্ছে। তারা তফসিলিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বহুজন সমাজ পার্টি, বহুজন মুক্তি পার্টি, আর পি আই, মূলনিবাসী পার্টি প্রভৃতি দলকে সমর্থন করছে না। তফসিলিদের হিন্দুত্ববাদী মনন স্বজাতির রাজনীতি বুঝতে ব্যর্থ।

(৬) আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি।। আমরা 'হিন্দু' হওয়ার ফলে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সর্বত্রই পরাধীন বা ব্রাহ্মণের অধীন। ফলে অর্থনৈতিক ভাবেও প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের তফসিলি সমাজ। ধর্মীয়ভাবে পুজো-যাগযজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে দান-আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত। দ্বিতীয়ত, রাজক্ষমতা হাতে নেই, ফলে রাজ কোষাগার বা রাজস্ব আমাদের হাতে নেই। চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডও ব্রাহ্মণদের দখলে। ফলে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ লাভবান, আমাদের তফসিলি সমাজ চাকরিতে নগণ্য, মন্ত্রীত্বে নগণ্য, শক্তিতে নগণ্য, ভারতে ধনী-ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের তালিকায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সমাজ অনেক উপরে। তফসিলিদের মধ্যে কিছু চাকরি আর ছোটখাটো দোকানদার বিদ্যমান। বাদবাকী ক্ষুদ্র-প্রান্তিক চাষী, শ্রমিক, মৎসজীবী, মুচি, মেথর, ধাঙড়, কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি।

(৭) আমাদের ইতিহাস ও স্বজাতি চেতনায় ক্ষতি।। ব্রাহ্মণরা ধর্ম থেকে রাজনীতি শাসকজাতি হওয়ার ফলে প্রচণ্ড ভাবে নিজেদের ইতিহাস ও স্বজাতি সচেতন। রাজক্ষমতায় থাকবার দৌলতে তারা সরকারি সিলেবাস রচনা করছে। সেখানে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র-গান্ধি-নেতাজি-কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়াচ্ছে। সেই সব বই পড়ে আমরাও প্রভাবিত এবং নিজেদের এলাকায় রাস্তাঘাট—পল্লী-ভবন-স্কুল প্রভৃতির নামকরণ হচ্ছে—রবীন্দ্র সরণী, সুকান্ত মঞ্চ, বিবেকানন্দ পল্লী, সারদাপল্লী, রামকৃষ্ণ মিশন, ইত্যাদি। কার্যত, আম্বেদকর বা দলিত আন্দোলনের ইতিহাস নেই। মণ্ডল-নস্কর-হালদার-সরদার কোনো মনীষীদের ইতিহাস পাঠ্যভুক্ত হয়নি। আমরা হিন্দু হওয়ার ফলে রামকৃষ্ণ-অনুকূল-বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর নিয়ে পড়ে আছি। কিন্তু স্বজাতির আম্বেদকর, জ্যোতিরাও, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, বেণীমাধব, রাইচরণ, মহেন্দ্রকরণ, পঞ্চানন, রাসমণি প্রমুখের ইতিহাস চর্চা করি না। আমরা হিন্দু হওয়ার ফলে, স্বজাতির ইতিহাস বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের ইতিহাস পাঠ করি, শ্রদ্ধা করি, চর্চা করি। স্বজাতির নেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণজাতির নেতৃত্বের প্রতি অধিক পরিমাণে শ্রদ্ধাশীল ও আনুগত্যশীল। তফসিলিভুক্ত মানুষেরা চ্যাটার্জী- ব্যানার্জী -মুখার্জী-চক্রবর্তী-দত্ত-মিত্র-সেন প্রভৃতি নেতা-মন্ত্রীদের প্রতি যতটা আনুগত্যশীল

ততটা আনুগত্যশীল নয় স্বজাতির মণ্ডল-নস্কর-সরদার-বিশ্বাস-মিস্ত্রী প্রভৃতি নেতা-মন্ত্রীদের প্রতি। বাঙলার দলিতসমাজের কাছে রামকৃষ্ণ (চট্টোপাধ্যায়), চৈতন্য (নিমাই মিশ্র), অনুকূল (চক্রবর্তী) প্রমুখ ধর্মীয় গুরু যতটা শ্রদ্ধাশীল সে তুলনায় এক বিন্দু শ্রদ্ধা নেই হরিচাঁদ ঠাকুরের (বিশ্বাস) প্রতি। হিন্দুমননই আমাদের মনকে স্বজাতিবিদ্বেষী ও ব্রাহ্মণপ্রেমী করে রেখেছে।

'হিন্দু' শব্দটি কবে 'ধর্ম' রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে

ভারতে ব্রিটিশ আমলের (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ) মাঝামাঝি পর্যন্ত আর্য-ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতি ছিল বটে, ধর্মের কোনো নাম ছিল না। অর্থাৎ, আর্য ব্রাহ্মণরা কোন ধর্ম পালন করছে, তার নাম কী, তার কোনো পরিচয় ছিল না। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আমরা সকলেই এখন 'হিন্দু' শব্দের সঙ্গে পরিচিত। প্রাচীন বৈদিক ধর্মকেই বর্তমানে হিন্দু ধর্ম বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে 'বৈদিকধর্ম' এই নামটিও ছিল কী? ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মে বর্ণাশ্রম প্রথা, যাগযজ্ঞ, অশৌচপালন, ব্রাহ্মণবর্ণকে শ্রেষ্ঠবর্ণ বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মান্যতা প্রদান, ব্রাহ্মণকে চাল-কলা-গাভী-সোনা-জমি-বিছানা-খাট-বালিশ-কাপড়-গামছা দান, পুরোহিত রূপে মান্যতা দেওয়া ইত্যাদি রীতি-প্রথা-আইন চালু হয়েছে সেই বৈদিকযুগ থেকে। বর্তমান হিন্দুধর্মে আজও সেইসমস্ত রীতি-নীতি বিদ্যমান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধর্মের নামে রীতি-নীতি চালু থাকলেও ব্রিটিশ আমলের মধ্যভাগ পর্যন্ত আর্যদের ধর্মের কোনো নাম ছিল না। 'হিন্দু' শব্দ যেমন প্রাচীন কোনো গ্রন্থে নেই বা ছিল না তেমনি 'বৈদিকধর্ম' বা 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম' এই জাতীয় শব্দ-ভাষাও প্রাচীন কোনো গ্রন্থে নেই। এই শব্দ-ভাষাগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির বইপত্রে। এ যুগের লেখকরাই আর্য-বৈদিকযুগের ধর্মকে বৈদিকধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম নামে অভিহিত করেছেন। কারণ, যে ধর্ম-সংস্কৃতি-রীতি-প্রথা আর্য-ব্রাহ্মণরা প্রবর্তন করেছিল তা বেদকেন্দ্রিক এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রবর্তিত। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, মনুসংহিতা কোথাও 'হিন্দু' শব্দ যেমন নেই তেমনি বৈদিকধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, এ জাতীয় শব্দ-ভাষাও নেই। আছে শুধু রীতি নীতি-সংস্কার-প্রথার নির্দেশনা। কার্যত, আর্যরা ধর্মীয় ভাবে বেনামীই ছিল। তবে পাশাপাশি বৌদ্ধ-জৈনরা ধর্ম নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

'সনাতন' শব্দটিও বহু প্রাচীন। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নিরীশ্বর ও নিরাত্মাবাদী ধর্মকে (ধম্ম) সনাতন ধর্ম্ম (ধম্ম) বলা হত। কারণ, সনাতন ধর্মও নিরীশ্বরবাদী এবং প্রকৃতি কেন্দ্রিক। সিন্ধু-হরপ্পাযুগের প্রাকৃতিক ধর্মকে 'সনাতন' ধর্ম বলা হত। আর্যরা এই 'সনাতন' শব্দটি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে নি। কারণ, আর্যদের প্রবর্তিত ধর্মে ঈশ্বর, ব্রহ্ম, অলৌকিকত্ব, আত্মা, স্বর্গ, বর্ণাশ্রম, পুজো, মন্ত্র, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ছিল। প্রাক-বৈদিক সনাতন বা পরবর্তী বৌদ্ধ-জৈন ধর্মে ঈশ্বর-আত্মা-স্বর্গ-পুজো-যজ্ঞ-বর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিষয় ছিল না। 'সনাতন' শব্দের অর্থ—শাশ্বত, চির সত্য, চিরন্তন ইত্যাদি। প্রকৃতি তথা বস্তুবাদই চিরন্তন সত্য হয়ে থাকে এবং তা যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে। আর্যদের ধর্মীয় সংস্কৃতি যুক্তি ও বিজ্ঞানমুখী ছিল না। বর্তমান হিন্দু ধর্মও বিজ্ঞানমুখী নয়।

ভারতে মুসলমান আমলে (১২০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিঃ) ব্রাহ্মণ কবিগণ তাঁদের কাব্য-কবিতায় সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দ গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখের কাব্যে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তা 'ধর্ম' হিসেবে নয়। মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণ সন্তান রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়। এঁরাও 'হিন্দু' নাম গ্রহণ করেননি। পরবর্তী ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণ সন্তান রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩ খ্রিঃ) ১৮২৯ সালে ব্রাহ্মসভা ও ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য বৈদিকযুগের ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটানো। তিনি ধর্মের নাম 'হিন্দু' ব্যবহার করেননি। ১৮৪৮ সালে দক্ষিণ ভারতে 'পরমহংসসমাজ' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গুজরাটের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—৮৩ খ্রিঃ)। ১৮৭৫ সালে তিনি বোম্বাইয়ে 'আর্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও বৈদিক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে আত্মনিবেশ করেছিলেন এবং 'হিন্দু' নাম ধারণ করেননি। রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩ খ্রিঃ) পর ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব নেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫ খ্রিঃ)। ১৮৫০ সালে ইনি ব্রাহ্মসমাজের নাম পাল্টে 'ব্রাহ্মধর্ম' দেন। সহযোগী কেশবচন্দ্র সেনও (১৮৩৮—১৮৮৪ খ্রিঃ) ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতৃত্ব। ১৮৬৬ সালে ইনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ'। এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এঁরা কেউই 'হিন্দু' শব্দটিকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে, মুসলমান আমলে রামানন্দ-চৈতন্যের 'বৈষ্ণবধর্ম' নামের পরে ব্রিটিশ আমলে দেবেন্দ্রনাথই প্রথম ব্যক্তি যিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ধর্মের সুস্পষ্ট নাম এর আগে আর্য-ব্রাহ্মণদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।

'হিন্দু' একটি ধর্মের নাম হতে পারে এবং তা আর্য-বৈদিক সংস্কৃতির নাম

হতে পারে, এই অভিধা প্রয়োগের সর্বপ্রথম কৃতিত্ব সম্ভবত এক কায়স্থ (শূদ্র) সন্তানের। তিনি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬—১৮৯৯ খ্রিঃ)। মেদিনীপুর জেলা গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'হিন্দু' এবং 'ধর্ম' দুটো পদ বা শব্দ সমাসবদ্ধ রূপে এই সর্বপ্রথম প্রয়োগ বলে আমরা দাবি করতে পারি। রাজানারায়ণের আর একটি প্রবন্ধ 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মধর্ম'। এরপর ১৮৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪ খ্রিঃ) 'প্রচার' পত্রিকার 'হিন্দুধর্ম' নামে প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো সম্মেলনে হিন্দুধর্মের উপর সরাসরি বক্তব্য রাখেন আর এক কায়স্থ (শূদ্র) সন্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২)। 'হিন্দু' শব্দটি বিদেশিদের দেওয়া, উহা ভালো নয়—এই জাতীয় কথা (দ্রঃ বিবেকানন্দ রচনাবলী ১০ম খণ্ড) বিবেকানন্দ বললেও শিকাগো বক্তৃতায় সেই 'হিন্দু' নামেই তিনি বাজিমাৎ করেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন—ভারতে প্রচলিত ইসলাম, খ্রিস্ট, পার্শী ব্যতীত আর যত মত (বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, আর্য, পরমহংস ইত্যাদি) আছে সবই হিন্দুধর্ম। কার্যত, বিবেকানন্দের দৌলতেই ভারত সহ বিশ্বে 'হিন্দু' শব্দটির এবং হিন্দুধর্মের সর্বাধিক প্রচার প্রসার ঘটেছে।

রাজনারায়ণ—বঙ্কিমচন্দ্র—বিবেকানন্দ, প্রমুখের পদাঙ্ক অনুসরণে অব্যবহিত পরে হিন্দুধর্মের প্রচার-প্রসারে সভা-সমিতি-সংগঠন ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করেন বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, মোহনদাস গান্ধি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ অজস্র ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এর পর বিশ্বহিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (RSS) , বজরং সহ বহু সংগঠন 'হিন্দু' শীর্ষ নামেই ধর্ম প্রচারে আত্মনিবেশ করেছে। বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের দেওয়া 'হিন্দু' নামের পরিবর্তে নিজেদের স্বসৃষ্ট কোনো নামে ধর্মের নাম করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখার মতন বুদ্ধি ও হিম্মতওয়ালা লোক বর্তমান ভারতে নেই বলেই মনে হয়। তবে, রামানন্দ-চৈতন্য দেবেন্দ্রনাথ—এই তিন ব্রাহ্মণ সন্তান 'বৈষ্ণব' ও 'ব্রাহ্ম' নামে ধর্মীয় আন্দোলন করেছিলেন। তাঁরা বিদেশিদের দেওয়া 'হিন্দু' নাম গ্রহণই করেন নি।

কেউ কেউ দাবি করেন, ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির লোকেরা ১৯২২/২৩ সালে নিজেদের 'হিন্দু' বলে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে, তাঁদের এই দাবি ইতিহাস-সত্য নয়। কারণ, মুসলমান আমল থেকেই ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির মধ্যে 'হিন্দু' পরিচয় গ্রহণের পালা শুরু হয়েছে।। ব্রাহ্মণরা নিজেদের 'হিন্দু' বলতে শুরু করে মুসলমান আমল থেকেই।

‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ নির্ণয়

‘হিন্দু’ শব্দটি বিদেশি শব্দ এবং বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানরাই ভারতীয়দের ‘হিন্দু’ নামে আখ্যায়িত করেছেন, এ বিষয়ে কোনো ভাষাবিদ, লেখক ও ঐতিহাসিকের দ্বিমত নেই। তবুও ‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন নানাজনে। অভিমতগুলো এরূপ ঃ (১) আধুনিক যুগের অনেকেই দাবি করছেন, ‘সিন্ধু’ থেকেই ‘হিন্দু’ শব্দের উৎপত্তি। সিন্ধু হল অবিভক্ত ভারতের (বর্তমান পাকিস্তান) উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি নদী ও নদী কেন্দ্রিক সভ্যতার নাম। প্রাচীন পারস্যের (ইরান) অধিবাসীরা নাকি এই ‘সিন্ধু’ কেই ক্রমশ ‘হিদুষ’ বা ‘হিন্দু’ নামে অভিহিত করেছেন। আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিদদের দাবি, পারস্যের অধিবাসীরা নাকি ‘স’ ধ্বনিকে ‘হ’ রূপে উচ্চারণ করতেন, সে দেশের বর্ণমালায় নাকি ‘স’ ধ্বনিকে ‘হ’ রূপেই উচ্চারণ করা হয়।

ভাষাবিদদের এই দাবি কতটা যুক্তিসম্মত তা বিচার করা দরকার। কারণ, পারস্য দেশের অভ্যন্তরেই ‘স’ ধ্বনি ‘স’ রূপেই বহাল তবিয়তে উচ্চারিত। কোথাও তার ‘হ’ রূপ লক্ষ করা যায় না। যেমন ঃ (ক) ‘পারস্য’ শব্দের মধ্যেই ‘স’ ধ্বনি বিদ্যমান। সে দেশের লোকেরা স্বদেশের নামকে ‘পারহ্য’ বলে উচ্চারণ করেন না। যদি করতেন তাহলে তাহলে ‘পারহ্য’ শব্দটিও চালু থাকতো ইরানে বা বিশ্বে। কিন্তু কেউ কি ‘পারহ্য’ শব্দ শুনেছেন? (খ) পারস্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজার নাম ‘সাইরাস’। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রাজার নাম দরায়ুস, জারোসেস, ক্যাম্বিসেস প্রমুখ। সর্বত্রই ‘স’ ধ্বনি বিদ্যামান। (গ) ভারতের পুরোহিত সম্প্রদায়কে যেমন ব্রাহ্মণ বলা হয় তেমনি পারস্যের পুরোহিত শ্রেণিকে ‘মেইগাস’ বলা হয়। (ঘ) পারস্যের ধর্মগ্রন্থের নাম ‘জেন্দ-আবেস্তা’। (ঙ) পারস্যের ধর্মগুরুর নাম ‘জরাথুস্ট্র’। সর্বত্রই ‘স’ ধ্বনি বিদ্যমান। পারস্যের অধিবাসীরা শুধু ভারতের ‘সিন্ধু’ শব্দটি ‘হিন্দু’ করে ফেললেন আর নিজেদের দেশীয় শব্দগুলো যথাযথ রেখে দিলেন, এই দাবি কি গ্রহণযোগ্য? আর যদি পারসিকদের বিকৃত উচ্চারণ ‘হিন্দু’কেই যদি আমরা শিরোধার্য করে নিই তাহলে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আমরা ভারতবাসীরা কেন বিদেশিদের বিকৃত উচ্চারণে নামাঙ্কিত হবো, এটা কি আমাদের কাছে সম্মানযোগ্য পরিচয়? আমাদের কি নিজস্ব কোনো পরিচয় ছিল না?

(২) অনেকের দাবি, ‘হিন্দু’ একটি ‘তদ্ভব’ শব্দ। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ‘তৎ’ (তার) অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থেকে জাত শব্দকে তদ্ভব বলা হয়। যেমন চন্দ্র (সং) থেকে চাঁদ (তদ্ভব)। হস্ত (সং) থেকে হাত (তদ্ভব)। এসব ক্ষেত্রে দেখা

যাচ্ছে, তদ্ভব শব্দগুলো আদি সংস্কৃত শব্দের আদ্যক্ষর বহন করছে। সংস্কৃত চন্দ্র এবং তদ্ভব চাঁদ—উভয় শব্দের আদ্যক্ষর 'চ'। 'হিন্দু' শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আদি 'সিন্ধু' শব্দের 'স' ধ্বনি তার মধ্যে নেই। তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা দাবি করবো যে, 'হিন্দু' একটি তদ্ভব শব্দ? নিশ্চয়ই এই দাবি যুক্তিসম্মত হবে না।

(৩) একদল নালায়েক ভাষাবিদ দাবি করছেন, হিমালয়ের 'হি' এবং হিমালয়ে জমাকৃত বরফজলের বিন্দু-র 'ন্দু'—এই দুটো শব্দ মিলিত হয়ে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। যদি এই দাবিটি মেনে নিতে হয় তাহলে বলতে হবে 'হিন্দু' শব্দটি দেশজ ও অতিপ্রাচীন শব্দ। কারণ, হিমালয় তো অতি প্রাচীন পর্বত। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, 'হিন্দু' নামক এই প্রাচীন শব্দ বা দেশবাসীর পরিচয়টি কেন বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হলো না? এতোবড় একটা দেশজ শব্দ, দেশবাসীর আত্মপরিচয় বাচক শব্দ এবং ধর্মবাচক শব্দ তো ওইসব গ্রন্থে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মুসলমান রাজত্বের (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) আগে রচিত ভারতের কোনো গ্রন্থে, এমন কি মন্ত্রেতন্ত্রে 'হিন্দু' শব্দ নেই।

আসল কথা, হিন বা হীন (নিকৃষ্ট) অর্থে বিদেশিরা ভারতীয়দের 'হিন্দু' বলে আখ্যায়িত করেছে। বহিরাগত আর্যরা যেমন আদিভারতীয় নাগরিকদের নিন্দার্থে বলত—অনার্য, দাস, দস্যু, শূদ্র, নিচুবর্ণ, ইতর, বর্বর ইত্যাদি। আজও তারা এসসি/এসটি/ওবিসিদের সোনার চাঁদ, সোনার চামচ, সোনার টুকরো, সোনার টিয়া, অন্যান্য বোকাচাঁদ (OBC), অসাধারণ, আম্বেদকরের সন্তান, সংরক্ষণ প্রাপ্ত বন্যজন্তু, সরকারের পোষ্যপুত্র, ডি-মেরিট ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করে থাকে। একইভাবে বিদেশি ইংরেজরাও ভারতীয়দের গেঁও, নেটিভ, বর্বর, অসভ্য, কালা-আদমি ইত্যাদি ভাষায় কটাক্ষ করত। বিদেশি পারসিক, গ্রিক, মুসলমানরাও ভারতীয়দের সুনজরে দেখত না। তাদের দ্বারা ভারতীয়রা পরাজিত পরাধীন হয়েছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। উর্দু ভাষার অভিধানে 'হিন্দু' শব্দের অর্থ করা হয়েছে—চোর, ডাকাত, গোলাম, ভৃত্য ইত্যাদি।

আমার মনে হয়, ভারতে আর্য-ব্রাহ্মণদের দ্বারা যে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি, আইন, নিয়ম ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা এক কথায় নিকৃষ্টমানের ছিল। বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথা, শ্রমিক শ্রেণিকে অচ্ছুৎ শূদ্র-নিচু বর্ণ বানিয়ে সমস্ত অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, ধর্মের নামে অত্যাচার, মিথ্যে কাল্পনিক দেব-দেবী প্রবর্তন—এসব অবস্থা দেখে ভারতীয়দের 'হিন্দু' আখ্যা দিয়েছিল বিদেশিরা। মুসলমান আমলের আগে পর্যন্ত ভারতের আর্য-অনার্য-বৌদ্ধ-জৈন-

শূদ্র-চার্বাক কেউই বিদেশিদের 'হিন্দু' শব্দ গ্রহণ করেননি। কিন্তু মুসলমান আমল থেকে ধীরে ধীরে 'হিন্দু' শব্দে পরিচিত হতে থাকে একাংশ। তারপর ইংরেজ আমলে 'হিন্দু' একটি ধর্ম ও জাতিবাচক শব্দে পরিণত হয়ে যায়। এই ইংরেজ আমলেই কিছু ব্রাহ্মণ-গবেষক তাই 'হিন্দু' শব্দের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য 'সিন্ধু' শব্দটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যাতে 'হিন্দু' শব্দের গা থেকে কটাক্ষবাচক গন্ধ দূরীভূত হয়ে যায়।

'হিন্দু' শব্দ সম্পর্কে বিবেকানন্দ, আম্বেদকর ও অন্যান্যদের অভিমত

আমরা সবাই জানি, হিন্দু ধর্মের শীর্ষতম প্রচারক এক কায়স্থ (শূদ্র) সন্তান। তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩—১৯০২)। জীবদ্দশাতেই তিনি স্বামীবিবেকানন্দ নামে পরিচয় লাভ করেন। কার্যত, বর্তমান ভারত সহ বিশ্বে তিনিই 'হিন্দু' শব্দটিকে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি অন্যান্য ধর্ম-মত সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা বললেও বাস্তবে তিনি হিন্দুত্ববাদী এবং চূড়ান্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী। আর হিন্দুত্ববাদ হলো প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৈদিকধর্মেরই আধুনিকতম নাম বা আন্দোলন মাত্র। তাঁর নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। ভারতের আর্য সম্প্রদায় এতদিন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো ধর্মের নামে পরিচিত ছিল না। অনার্যরা অবশ্য বৌদ্ধ-জৈন নামে পরিচিত ছিল। বিবেকানন্দের উদ্যোগে আর্যজাতি এবং পাশাপাশি অনার্য শূদ্রজাতি 'হিন্দু' পরিচিতি পেয়েছে। এর ফলে, খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তকরণ রদ হয়েছে। ইসলামে ধর্মান্তকরণও রদ হয়েছে। এবং এই হিন্দুত্ববাদের উপর দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নেতারা স্বদেশি আন্দোলন করেছেন মূলত কংগ্রেস দলের দ্বারা। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শূদ্র, দলিত তথা তফসিলি বর্গ (SC-ST-OBC) । এদেরকে হিন্দুভুক্ত করে নিচুজাত শূদ্রবর্ণে পতিত করা হয়েছে। এরা আর স্বাধীন স্বধর্ম (বৌদ্ধ) নিয়ে মাথা উঁচু করতে পারছে না।

সে যাইই হোক, হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ প্রচারক বিবেকানন্দও 'হিন্দু' শব্দটি পছন্দ করতেন না। সেটা জানা-বোঝার দরকার আছে। তিনি বলেছেন, "তাঁহাদের (ভারতীয়দের) দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' এবং দেশবাসীর 'হিন্দু' নাম ঠিক নয়। উহা বিদেশিদের উদ্ভাবিত। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত'।" (দ্রঃ স্বামী

বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৮, প্রথম সংস্করণ মার্চ ১৯৬৪, প্রকাশক উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কল-৩)। ১৮৯৪ সালের ১৫ফেব্রুয়ারি ডেট্রয়েট ট্রিবিউন পত্রিকায় এই বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল। আজ যারা বিবেকানন্দকে হিন্দুত্ববাদের প্রতীক রূপে প্রচার করতে চাইছে তাদেরও জানা দরকার 'হিন্দু' শব্দ সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমতটি কীরূপ ছিল।

'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে ভারতের সংবিধানে-প্রণেতা বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯৯—১৯৫৬) পরিষ্কার অভিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু' নামটাই একটি বৈদেশিক নাম। 'হিন্দু' শব্দটা মুসলমানদের দেওয়া। স্থানীয় (ভারতীয়) অধিবাসী এবং মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোঝাবার জন্য মুসলমানরাই স্থানীয় অধিবাসীদের 'হিন্দু' নামে অভিহিত করেছিল। (দ্রঃ জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী বলেছেন, 'হিন্দু' শব্দটি কোথায় পেলেন? কোন বেদে বা উপনিষদে? কোনো বেদ বা উপনিষদে তো হিন্দু ধর্মের কথা নেই। আছে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কথা। 'হিন্দু ধর্ম'— এই ধারণা তো এসেছে মাত্র আটশো বছর আগে' (অর্থাৎ মুসলমান আমলে)। (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৩, সম্পাদক সমীপেষু বিভাগে চিঠিপত্র অংশ)। 'হিন্দু' শব্দটি প্রথমে জাতি হিসেবে গ্রহণ করাটা শুরু হয়েছে মুসলমান রাজত্বে (১২০০---১৭৫৭ খ্রিঃ)। তারপর ইংরেজ আমলের (১৭৫৭—১৯৪৭ খ্রিঃ) মাঝামঝি থেকে শেষের দিকে 'হিন্দু' একটি ধর্মবাচক শব্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দের গ্রহণযোগ্যতা খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণদের একাংশ 'হিন্দু' পরিচয় ক্রমশ ধারণ করার পক্ষপাতী হলেও অন্য অংশ ছিল এর ঘোরতর বিরোধী। যেমন, ইংরেজ আমলেই ১৮৭০ সাল নাগাদ কাশীর (উঃ প্রদেশ) এক ধর্মসভায় ভারতীয় পণ্ডিতরা নিজেদের 'হিন্দু' বলতে রাজি হননি। তার কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছিলেন যে, পারসিকরা 'ডাকাত' অর্থে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছে ঃ হিন্দুশব্দো হি যবনেম্বধর্মির্জন বোধক ঃ। (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬, পুস্তক পরিচিতি অংশ অনন্তলাল ঠাকুরের 'নিবন্ধাবলী' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন গৌতম চক্রবর্তী)। উর্দু অভিধানে 'হিন্দু' অর্থ চোর, ডাকাত, ম্লেচ্ছ, রাহাজানি, ভৃত্য, দাস ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে, এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কাশীর পণ্ডিতরা। তাঁরা বিদেশিদের দেওয়া গালাগালি বাচক 'হিন্দু' শব্দ তাই গ্রহণ করতে চাননি।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ সনাতন তথা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন

আমাদের বলতে বোঝানো হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে তফসিলিবর্গ (SC-ST-OBC) হিসেবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীকে। ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে এরা প্রাক -আর্য-ভারতের অধিবাসীদের বংশধর। অসুর, মেহেরগড়, হরপ্পা-দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রাক-আর্য ভারতের মানবসভ্যতা। বর্তমান তফসিলিবর্গ ওইসব সভ্যতারই উত্তরসূরী। তফসিলিবর্গকে ইদানীং মূলনিবাসী, আদিমবাসী, আদিভারতীয়, বহুজন, দলিত, অনগ্রসর, নির্যাতিত শ্রেণি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অভিহিত করা হয়। পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, বাগদি, রাজবংশী, কৈবর্ত, কপালি, বারুজীবী, তিলি, কুম্ভকার, কর্মকার, ধোপা, নাপিত, মুচি, মুণ্ডা, বেদিয়া, অসুর প্রভৃতি তফসিলিগোষ্ঠী বর্তমানে মূলনিবাসী বহুজন হিসেবে পরিচিত।

বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, আদিবাসী তফসিলি উপজাতি সমাজের কিছু গোষ্ঠী ব্যতীত বাদবাকী তফসিলিবর্গ (SC-OBC) হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েছে। হিন্দু অর্থাৎ বহিরাগত আর্যদের দ্বারা প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দু হিসেবে তফসিলিবর্গের মানুষজন, পরিবার ও সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতিনীতি প্রথা পালন করে থাকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি, হল—পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা রূপে ব্রহ্ম তথা ঈশ্বর নামক কল্পিত শক্তিকে বিশ্বাস, পৃথিবীর বাইরে স্বর্গলোক বা দেবলোকের কল্পনা, মানব শরীরে আত্মা নামক এক অমর জিনিসের অস্তিত্বকে স্বীকার করা, দেহের মৃত্যুর পর আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস, পাপ-পুণ্য-ইহকাল-পরকাল প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাগযজ্ঞ পশুবলি-মন্ত্র-পুজো-প্রার্থনা করা, বর্ণাশ্রম আইন মেনে ব্রাহ্মণ বর্ণকে উঁচুবর্ণ ও পুরোহিত রূপে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা, মা-বাবা গুরুজনের মৃত্যুতে অশৌচপালন-শ্রাদ্ধযজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে দান ইত্যাদি। এসবই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের রীতি। বর্তমান তফসিলিবর্গের পৌণ্ড্র-নমঃশূদ্র-বাগদি-কৈবর্ত-ধোপা-নাপিত-কুম্ভকার-কর্মকার-সদগোপ-গোয়ালা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মানুষেরা এইসব হিন্দু রীতি মেনে চলছে।

হিন্দুধর্মে বর্ণাশ্রম তথা জাতিভেদ প্রথা জন্মভিত্তিক। অর্থাৎ জন্মসূত্রে যে যেখানে (বর্ণে) জন্মেছে সেই জাত হিসেবেই চিহ্নিত। অনেকে দাবি করেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বর্ণাশ্রম প্রথা গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে তৈরি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের এই কথা বাস্তবসম্মত ছিল না। তার প্রমাণ শম্বুক ও একলব্য। শূদ্র ব্যাধের সন্তান শম্বুক নিজ যোগ্যতায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছিল। মনুসংহিতা

নির্দেশিত বর্ণাশ্রম আইনে, শূদ্রের শিক্ষার্জন অপরাধ। ব্রাহ্মণ বশিষ্টের নির্দেশে রাম তাই শম্বুককে হত্যা করেছিল। একলব্যও ব্যাধের সন্তান। নিজের যোগ্যতায় সে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছিল। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য সুকৌশলে তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দাবি করে একলব্যকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছিল, একলব্য যাতে আর ধনুক চালাতে না পারে। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য যদি বাস্তবসম্মত হত তাহলে শম্বুক-একলব্যরা এভাবে নির্যাতনের শিকার হত না। তারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় তকমা পেতেই পারতো।

যদি প্রশ্ন করা হয়, হিন্দু ধর্মে তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) মানুষদের স্থান কোথায়? অর্থাৎ কোন বর্ণে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কোন বর্ণে? প্রথম তিনটি বর্ণ বহিরাগত আর্যদের বর্ণ। শেষ শূদ্রবর্ণ মূলনিবাসীদের বর্ণ। আর্যরা মূলনিবাসীদের শূদ্রবর্ণে পতিত করে দিয়েছিল। গীতায় বলা হয়েছে (১৮ অধ্যায়) শূদ্রের কাজ উপরের তিন বর্ণের সেবা করা। শূদ্রের শিক্ষার অধিকার থাকবে না। অর্থ সঞ্চয়ের অধিকার থাকবে না, রাজনীতি ও ধর্মপালনের অধিকার থাকবে না। এসব নির্দেশ আছে গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে।

ঘটনা হল, হিন্দুশাস্ত্রের এসব আইন বা নির্দেশ বলবৎ ছিল শূদ্রদের উপর। কয়েকশো বছর ধরে অস্পৃশ্য রাখা হয়েছিল মূলনিবাসী শূদ্রদের। সে কারণে আজ সেই শূদ্রসমাজকে তফসিলিভুক্ত (SC-ST-OBC) করা হয়েছে। কার্যত হিন্দু ধর্মে তফসিলিবর্গের স্থান নিচুজাত শূদ্রবর্ণে।

ভারতের ইতিহাস বলছে, বহিরাগত আর্যসমাজের বাইরে অবস্থিত এই শূদ্র তথা তফসিলিবর্গ একসময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। বহিরাগত আর্য-পাঠান-মুঘল -ব্রিটিশ প্রভৃতি শাসক ও তাদের হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম আজ ধরাশায়ী। বৌদ্ধদের বড় অংশ হিন্দুতে ধর্মান্তরিত। বাদবাকি ইসলাম ও খ্রিস্টান। কিছু অংশ বৌদ্ধ-জৈন-শিখ রূপে অবস্থান ককরছে।

ভারতে আর্য আগমনের আগে প্রকৃতি তথা সনাতন ধর্ম ছিল। সনাতন ধর্মে কোনো কুসংস্কার বা ঈশ্বর তত্ত্ব এবং জাতিভেদ তত্ত্ব ছিল না। আর্যরা সেই সনাতন ধর্মের ধ্বংসসাধন করে। পরবর্তীকালে বুদ্ধ-মহাবীর-অশোক প্রমুখ আদিবাসী সন্তানদের উদ্যোগে সনাতনধর্মের পুনর্জাগরণ হয়। বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি নামে সনাতন ধর্ম পরিচিত হয়। ভারত সহ বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রভাব ফেলে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে সময় বৌদ্ধ হয়ে যান। কারণ তাঁদের রক্তেই ছিল আদিভারতীয় সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণরা ফের বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটায়। বৌদ্ধ পরবর্তী শুঙ্গ-গুপ্ত-

সাতবাহন-সেন প্রভৃতি যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বহিরাগত ইসলাম ধর্মও তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করে। বৌদ্ধরা তাদের স্বধর্ম রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বহিরাগত আর্য ও মুসলমানদের হিন্দু ও ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে পড়েন।

বাঙলার তফসিলিবর্গ (SC-ST-OBC) একসময় বৌদ্ধ ছিল, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। পূর্বভারত তথা বাঙলার ইতিহাস হল ঃ (১) সম্রাট অশোক প্রমুখ মৌর্যরাজত্বে আমাদের বঙ্গভূমি মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় পূর্বভারতে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল উত্তরভারত কেন্দ্রিক। আমাদের বাঙালী পূর্বপুরুষগণ ছিল প্রকৃতি তথা সনাতনধর্মী। তারপর মৌর্যরাজত্বে বৌদ্ধ প্রভাবে ক্রমশ সবাই বৌদ্ধ পরিচিতি লাভ করে। বাঙলায় বৌদ্ধ শ্রমণ সঙ্ঘ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। (২) খ্রিঃপূঃ ১৮৫ অব্দে ব্রাহ্মণ্যবাদী শুঙ্গরাজত্ব দখল করে মগধের সিংহাসন এবং মৌর্যরাজত্বের অবসান ঘটায়। ভারতে ফের ব্রাহ্মণ্যধর্ম মাথাচাড়া দেয়। পরবর্তী গুপ্ত-সাতবাহন যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তীব্র আকার ধারণ করে। তবুও এ সময় বাঙলার বৌদ্ধ ধর্মে আঘাত নেমে আসেনি। (৩) সর্বভারতীয় স্তরে সাতবাহন রাজত্বের অবসান হয় ৯৪ খ্রিস্টাব্দে এবং গুপ্তবংশের পতন ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। মৌর্য-সাতবাহন-গুপ্তযুগে যে অখণ্ড ভারতে হয়েছিল তার ভাঙচুর শুরু গুপ্তযুগের অবসানে। পূর্বভারতে বাঙলার সিংহাসনে বসেন শশাঙ্ক। তিনি প্রচণ্ড বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রিঃ) পর প্রায় ১৫০ বছর মাৎসন্যায় চলে বাঙলায়। (৪) মাৎসন্যায় থামানোর জন্য বাঙলার বৌদ্ধ সঙ্ঘগুলো সে সময় বিশেষ ভূমিকা নেয়। বৌদ্ধসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বৌদ্ধশ্রমণ ব্যাপট করণের পুত্র গোপালকে বাঙলার সিংহাসনে বসানো হয়। বাঙলায় বৌদ্ধধর্মী পালযুগ রাজত্ব করে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমান বাঙলা ভাষার জনকরাই তো বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই পালযুগেই বাংলাভাষা চর্যাপদের সৃষ্টি হয় পালি-প্রাকৃত থেকে। (৫) ব্রাহ্মণ্যধর্মী সেন রাজারা বাঙলা আক্রমণ করে বৌদ্ধধর্মী পাল রাজত্বের ধ্বংস করেন ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তারপর ১২০০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম আক্রমণের আগে পর্যন্ত সেনরাজাদের চক্রান্তে বহু বৌদ্ধ নিহত হয়, বহু বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করা হয়। পরবর্তী মুসলমান রাজত্বেও বৌদ্ধদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলে। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধধর্মকে ম্লেচ্ছধর্ম এবং বৌদ্ধদের গায়ে চোর, ম্লেচ্ছ, নীচ ইত্যাদি তকমা দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলে ক্রমশ স্বধর্মের (বৌদ্ধ) ইতিহাস ভুলে যায়। সেই বিস্মৃতি আজও বিদ্যমান। (৬) বিহার-বাঙলা-উড়িষ্যা এবং

পূর্বভারতে বৌদ্ধরাজত্বে বা সর্বভারতীয় মৌর্যরাজত্বে পূর্বভারতে নালন্দা, রক্তমৃত্তিকা (মুর্শিদাবাদ), সোমপুরী, ওদন্তপুরের মোগলমারি কিংবা উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় এবং অনত্র ইদানীং খননকার্যে বা স্থাপত্যে ভাস্কর্যে বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বাঙলার মাটির তলদেশে আজও বুদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি উদ্ধার করা হচ্ছে। (৭) বাঙলায় প্রচলিত চড়কপুজো বা শিবপুজো, শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা এবং সর্বোপরি ধর্মঠাকুরের পুজো ইত্যাদি ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রমাণ করছে বৌদ্ধ ঐতিহ্য। যদিও বৌদ্ধধর্মে কোনো দেব-দেবী-পুজো নেই। কিন্তু ইতিহাস বলছে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধরা পাল্টা দেব-দেবী-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটায়। ধর্মঠাকুর আদতে বুদ্ধকেই বলা হয়। আর যোগীনাথ বা নাথ-যোগী বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের ভিন্ন রূপ মাত্র।

গ্রন্থ সূত্র

১. ধূর্জটি লশ্‌কর (নস্কর)—পুণ্ড্রদেশে বৌদ্ধসভ্যতা
২. নজরুল ইসলাম—বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক
৩. বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়—বর্ণব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা
৪. পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ—অতীত ও ঐতিহ্য (৭ম শ্রেণির ইতিহাস)
৫. অনন্তলাল ঠাকুর—নিবন্ধাবলী
৬. গৌতম চক্রবর্তী—তাঁকে ফিরে পড়া আজ অত্যন্ত জরুরী, পুস্তক পরিচয়, আনন্দবাজার পত্রিকা (৩১-১২-২০১৬)
৭. বাবাসাহেব আম্বেদকর—জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি
৮. স্বামীবিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড
৯. এবং ও আমরা পত্রিকার গৌতম বুদ্ধ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩
১০. ননীগোপাল দেবদাস—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম
১১. আবীরা বসু চক্রবর্তী (অনুবাদ)—ভারতবর্ষ ঃ ঐতিহাসিক সূচনা ও আর্যধারণা
১২. ওয়ামন মেশ্রামজির রচনাবলী
১৩. সুকোমল সেন—ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণি ও জাতিভেদ।
১৪. সুকৃতিরঞ্জন বিশ্বাস—বঙ্গভঙ্গ-দেশত্যাগ-দাঙ্গা

লেখকের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১. যুক্তি ও মানবতাবাদ ২০০৬
২. সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদিত) ২০০৮
৩. মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও বহুজন সমাজপার্টি ২০০৮
৪. পৌণ্ড্র সমাজ পরিচয় (সম্পাদিত) ২০১০
৫. জাগো পৌণ্ড্রসমাজ জাগো ২০১১
৬. মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ (সম্পাদিত) ২০১১
৭. ব্রাহ্মণবর্জিত মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্ধতি ২০১২
৮. সদ্ধম্ম বৌদ্ধধম্ম ঃ ভারতীয় ঐতিহ্য তথা সনাতনধম্ম ২০১২
৯. আমরা কিভাবে ভোট নষ্ট করে চলেছি ২০১৪, ২০২১
১০. তফসিলিদের প্রতি ব্রাহ্মণদের কটূক্তি ২০১৪
১১. সনাতনধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং তফসিলি সংরক্ষণ ২০১৬
১২. তফসিলিবর্গের অধিকাংশ শিক্ষিতমানুষের চরিত্র ২০১৬
১৩. বৌদ্ধদর্পণ (ব্রাহ্মণ-বর্জিত বিবাহ-গৃহপ্রবেশ-শ্রদ্ধানুষ্ঠান পদ্ধতি) ২০১৭
১৪. ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ ২০১৭, ২০২১
১৫. হিন্দু নামটি বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের দেওয়া ২০১৮
১৬. ব্রাহ্মণ দ্বারা পৌরোহিত্য করালে কি কি অমঙ্গল হয় ২০১৮, ২০২১
১৭. পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের ইতিহাস ২০১৮
১৮. বাবাসাহেব আম্বেদকর কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ২০১৮
১৯. মানুষের ধর্ম পঞ্চশীল ২০১৯
২০. ভারতীয় সংবিধানের জনক বাবাসাহেব আম্বেদকরের বৌদ্ধধম্মে প্রত্যাবর্তন একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ২০১৯
২১. হিন্দুধর্মে নারীর স্থান ২০২১
২২. নবজাগরণ আন্দোলনের অগ্রদূত হরিচাঁদ ২০২১
২৩. বাবাসাহেব আম্বেদকরের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ২০২২
২৪. বাঙালী পৌণ্ড্রজাতির ইতিহাস ২০২৩